জীবন জাগার গল্প - ৮

দুজন দুজনার

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

Scanned with CamScanner

দু'জন দু'জনার

[দাম্পত্য জীবনের গল্প]

মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

শিক্ষক

তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

Scanned with CamScanner

উৎসর্গ

এক রাতেই বিধবা হয়ে যাওয়া অসংখ্য বোনকে!

যাদের স্বামীরা প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহব্বতে ছুটে এসেছিলেন। রাব্বে কারীম তাদের সবার জীবন আসান করে দিন! ইজ্জতের সাথে বাকি দিনগুলো গুজরান করার বন্দোবস্ত করে দিন! আমীন!

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

জীবন জাগার গল্প ৪৪৮ : লাজরাঙা হাসি ও অনন্ত প্রেম ...১১
জীবন জাগার গল্প ৪৪৯ : আমার সোনা বউ ১৬
জীবন জাগার গল্প ৪৫০ : হি শী ২২
জীবন জাগার গল্প ৪৫১ : তালাকনামা ২৪
জীবন জাগার গল্প ৪৫২ : ঘোলাটে পানি ২৫
জীবন জাগার গল্প ৪৫৩ : পরিশীলিত আচরণ ২৬
জীবন জাগার গল্প ৪৫৪ : দশটি নসীহত ২৭
জীবন জাগার গল্প ৪৫৫ : শুকনো ফুল ৩১
জীবন জাগার গল্প ৪৫৬ : সুলতানুল কালব ৩২
জীবন জাগার গল্প ৪৫৭ : ভালোবাসার রহস্য ৩৩
জীবন জাগার গল্প ৪৫৮ : বুদ্ধিমতী বধু ৩৪
জীবন জাগার গল্প ৪৫৯ : বিরলতম স্বামী ৩৫
জীবন জাগার গল্প ৪৬০ : অবহেলা ৩৬
জীবন জাগার গল্প ৪৬১ : বিশ্বাস-অবিশ্বাস ৩৮
জীবন জাগার গল্প ৪৬২ : বিয়ের আইন ৪১
জীবন জাগার গল্প ৪৬৩ : সাইকেল-প্রেম ৪২
জীবন জাগার গল্প ৪৬৫ : বাবার আদর ৪৩
জীবন জাগার গল্প ৪৬৬ : ক্ষমার রবার ৪৩
জীবন জাগার গল্প ৪৬৭ : পুতুল বিক্রি ৪৫

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প ৪৬৮ : বউমাপা দাড়িপাল্লা ৪৭
জীবন জাগার গল্প ৪৬৯ : জামাই শিক্ষা ৫০
জীবন জাগার গল্প ৪৭০ : স্বপ্নময় বিয়ে ৫০
জীবন জাগার গল্প ৪৭১ : দরজা খোলার ব্যবস্থা ৫৪
জীবন জাগার গল্প ৪৭২ : ফেক নম্বর ৫৫
জীবন জাগার গল্প ৪৭৩ : পানিসিঞ্চন ৫৮
জীবন জাগার গল্প ৪৭৪ : বৌ নয় মৌ! ৬০
জীবন জাগার গল্প ৪৭৫ : স্বামী-স্ত্রী! ৬১
জীবন জাগার গল্প ৪৭৬ : মনের মত বউ ৬২
জীবন জাগার গল্প ৪৭৭ : আমলী যিন্দেগী ৬৩
জীবন জাগার গল্প ৪৭৮ : পুরুষদের স্বভাব ৬৫
জীবন জাগার গল্প ৪৭৯ : অলক্ষুণে স্বামী (!) ৬৬
জীবন জাগার গল্প ৪৮০ : ভালোবাসার শক্তি..................৬৮
জীবন জাগার গল্প ৪৮১ : বিচক্ষণ পুত্রবধু ৭০
জীবন জাগার গল্প ৪৮২ : ভালোর জন্য ভালো ৭১
জীবন জাগার গল্প ৪৮৩ : জানা+জানি ৭৩
জীবন জাগার গল্প ৪৮৩ : দুলালী ও ডাকহরকরা ৮০
জীবন জাগার গল্প ৪৮৪ : বিবাহিত ও নেশাচুর..............৮৭
জীবন জাগার গল্প ৪৮৫ : হালাল প্রেমিক! ৮৯
জীবন জাগার গল্প ৪৮৬ : স্মৃতিমাখা গালিচা ৯৫

Scanned with CamScanner

শুরুর কথা

দু'জন দু'জনার? আর কারো নয়? অবশ্যই অন্যেরও, তবে দু'জনের মাঝে এমন কিছু 'রসায়ন' আল্লাহ সৃষ্টি করে দেন, যা অন্য কারো সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয় না। মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। অনস্বীকার্য! মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক কোনওভাবেই ছিন্ন করার মতো নয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলতে গেলে বাহ্যিকভাবে শক্ত কোনও ভিতের ওপর থাকে না। শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করেই যে সম্পর্ককে টুটে ফেলা যায়, সেটা কিভাবে বছর কে বছর টিকে থাকে?

❖

শরীয়ত সমর্থন না করলেও, একজন পিতাও কখনো কখনো পুত্রের প্রতি চূড়ান্ত রাগ প্রকাশ করতে গিয়ে, তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। কিন্তু বাবা সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা প্রচলিত করলেও, কোনও মা তার ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারেন না। এমন ঘটনা ঘটতেও শোনা যায়নি। মায়ের সাথে ছেলের সম্পর্ক এতটাই অনড়! কিন্তু দু'জন-দু'জনার সম্পর্ক মাত্র একটা শব্দের আঘাতেই ভেঙে যাওয়ার আশংকা নিয়েও অটুট থাকে কেন?

❖

একটা সংসার টিকে থাকার ক্ষেত্রে কার ভূমিকা বেশি প্রবল? স্বামীর নাকি স্ত্রীর? এক কথায় উত্তর দেয়া অসম্ভব! কারণ কোনও সংসারে স্ত্রীর ত্যাগ বেশি থাকে। কোনও সংসারে স্বামীর বেশি। দুর্লভ কোনও সংসারে দু'জনের ত্যাগই প্রায় সমান থাকে।

❖

একটা প্রশ্ন প্রায়ই আমাকে ব্যস্ত রাখে! স্বামী ভালো আর স্ত্রী একটু অন্যরকম অথবা স্ত্রী ভালো আর স্বামী একটু অন্যরকম! এখন একটা সমাধান বের করা দরকার: দু'প্রকার 'যুগল'-এর মধ্যে কে কাকে বেশি সহজে ভালোর দিকে টেনে আনতে পারে? ভালো স্বামী কি তার স্ত্রীকে বেশি সহজে ভালোর দিকে টেনে আনতে পারে নাকি ভালো স্ত্রী তার স্বামীকে বেশি সহজে ভালোর দিকে টেনে আনতে পারে?

Scanned with CamScanner

❖

অনেক পরিবারেই দেখা যায়, বিয়ের প্রথম বছর বা প্রথম দুয়েক বছর ভুল বোঝাবুঝি বা মনোমালিন্য একটু বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে! এটা কি ভবিষ্যতের সম্পর্ককে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর প্রস্তুতি? তাহলে যেসব পরিবারে প্রথম বছরগুলোরতেও কোনও সমস্যা দেখা দেয় না, তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্পর্ক শক্ত নয় বলবো?

❖

আচ্ছা, কে বেশি ভালোবাসতে পারে? স্ত্রীর ভালোবাসার শক্তি বেশি নাকি স্বামীর ভালোবাসার শক্তি বেশি? নারী নরম স্বভাবের হয়ে থাকে! পুরুষের স্বভাবে এক ধরনের কাঠিন্য থাকে! এটা দেখে কি সিদ্ধান্তে চলে আসবো, ভালোবাসার শক্তি নারীর বেশি। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর ভালোবাসার শক্তি তুলনামূলক বেশি? হিশেবটা কি এতই সরল? কোনও গরল নেই?

❖

ভালোবাসা কি শিখতে হয়? একজন ভালো প্রেমিক হতে হলে কি প্রেমটা আগে থেকেই শিখতে হয়? একজন ভালো স্বামী হতে হলে কি 'স্ত্রী-সোহাগ'টা আগে থেকে শিখে রাখতে হবে? একজন ভালো স্ত্রী হতে হলে 'স্বামী-সোহাগ'টা আগে থেকে শিখে রাখতে হবে?

❖

দাম্পত্যকলহে কার ভূমিকা বেশি? স্বামীর নাকি স্ত্রীর? দাম্পত্যকলহের মূল কে? স্বামী নাকি স্ত্রী? দাম্পত্যকলহের ক্ষেত্রে কোনটা বেশি সক্রিয় কারণ? স্বামীর রুক্ষস্বভাব নাকি স্ত্রীর ননস্টপ অভাব-অভিযোগ?

❖

একটি সুখী পরিবারের সংজ্ঞা কী? টাকা-পয়সার অভাব না থাকা? স্বামীর বিত্ত-বৈভব? স্ত্রীর অনুপম সৌন্দর্য? একটি সুন্দর বাড়ি? ফুটফুটে সন্তান? স্বামীর বা স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা?

❖

গল্প পড়ে কি সুখী পরিবার গড়া যায়? কি জানি! তবুও আমরা একটু আশা করতেই পারি, গল্পগুলো পড়ে কারো মনে যদি একটু ভালো লাগা জন্ম নেয়! কারো চোখটা সামান্য চিকচিক করে ওঠে! কারো ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়!!!

Scanned with CamScanner

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৮

লাজরাঙা হাসি ও অনন্ত প্রেম

প্রেমের বীজ!

আবুল আস। মনে মনে আশা খালাতো বোনকে বিয়ে করবেন। খালা তো রাজি। একদিন সাহস করে খালুজির কাছেও প্রস্তাবটা পাড়লেন।

-খালুজি! আমি যয়নবকে বিয়ে করতে চাই!

-তাই! ঠিক আছে, আমি একটু তোমার বোন আর খালার মতামতটা জেনে নিই।

.

-মা-মণি যয়নব! তুমি কি এ প্রস্তাবে রাজি?

লজ্জায় মেয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। মুখে হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মেয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। খাদীজা মেয়েকে সস্নেহে কোলে টেনে নিলেন।

ভালোবাসার সূচনা!

বিয়ে হয়ে গেল। জন্ম হলো ফুটফুটে দুটি সন্তানের। আলী ও উমামা। আবুল আস ব্যবসায়ী মানুষ। দেশে-বিদেশে ঘুরতে হয়। এবারও গেলেন। সফর শেষে ফিরে এলেন। একটুখানি জিরোবার পর যয়নব বললেন,

-আব্বু নবী হয়েছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

-আগে আমাকে একটু জানালেই পারতে!

আবুল আস বেজার মুখে উঠে গেলেন। যয়নব পিছু পিছু গিয়ে বললেন,

-কেন, আব্বু তো মিথ্যা বলেন না। সবসময় সত্য বলেন। আর আম্মু ও বোনেরাও ইসলামগ্রহণ করেছে। চাচাত ভাই আলী ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনার ফুফাত ভাই উসমানও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনার বন্ধু আবু বকরও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনিও চলুন না আব্বুর কাছে!

Scanned with CamScanner

-যাই বলো যয়নব! লোকেরা বলবে: আবুল আস তার কওমকে ছেড়ে গেছে। স্ত্রীকে খুশি করতে বাবার ধর্মত্যাগ করেছে। আমি মানুষের এ-কটূক্তি, অপবাদ সহ্য করতে পারবো না। আচ্ছা যয়নব, তুমি কি তোমার অবস্থানটা একটু পুনর্বিবেচনা করতে পারো না?

-না, এ অসম্ভব! তবে আমি আপনার স্ত্রী। আপনি যাতে সত্যের সন্ধান পান সেজন্য দু'আ-চেষ্টা করে যাবো। আর সুদিনের প্রতীক্ষা করবো।

.

যয়নব কথা রেখেছিলেন। তিনি তার ভালোবাসাকে হারিয়ে যেতে দেননি। বিশটা বছর তিনি পরম ধৈর্যের সাথে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও অন্য কারো কথা ভাবেননি।

বিচ্ছেদের ঘনঘটা!

হিজরতের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। যয়নব এসে বললেন,

-আব্বু! আমি কি আলী-উমামার বাবার সাথে মক্কায় থেকে যেতে পারবো?

-কেন পারবে না মা! অবশ্যই পারবে।

.

বদর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। সবার সাথে আবুল আসও কুরাইশদের সাথে এলেন। যোদ্ধাবেশে। শ্বশুরের বিরুদ্ধে। ভাই-বেরাদরদের বিরুদ্ধে।

যয়নব এমন কিছুরই আশংকা করে আসছিলেন এতদিন ধরে। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

-আল্লাহ গো! আমি নিজে এতিম হওয়া বা আমার সন্তান এতিম হওয়া, দুটোকেই ভয় করি। আপনি হেফাজত করুন।

.

যুদ্ধ শেষ হলো। আল্লাহ যয়নবের দু'আ কবুল করলেন। কেউ এতিম হলো না। আবুল আস বন্দী হলেন। সবাই মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পাচ্ছে। যয়নব ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার কাছে তো মুক্তিপণ দেয়ার মতো কিছুই নেই। সম্বল বলতে মায়ের দেয়া একটা হার আছে। মায়ের স্মৃতিমাখা হারটা দিয়ে দিতে বুকটা হু হু করে উঠলো। তবুও উপায় যে নেই।

.

Scanned with CamScanner

আবুল আসের ভাই হারটা নিয়ে মদীনায় এলো। নবীজি মসজিদে বসে আছেন। মুক্তিপণ নিয়ে একে একে বন্দীদের ছেড়ে দিচ্ছেন। এক সাহাবী তার হাতে মুক্তিপণ তুলে দিচ্ছিলেন। এবার দিলেন একটা হার। নবীজি সাথে সাথে বললেন,

-এটা কার মুক্তিপণ?

-আবুল আসের।

নবীজি কেঁদে দিলেন। দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। মনে পড়ে গেল অনেক স্মৃতি। অনেক কথা। দাম্পত্য জীবনের সেরা সময়টা। আকুল স্বরে বললেন,

-এ তো খাদীজার হার!

নবীজি মিনতি করে বললেন,

-সাহাবীরা! তোমাদের অনুমতি হলে, আবুল আসকে এমনি এমনি মুক্তি দিয়ে দেই? হারটা যে বড়ই স্মৃতিমাখা! মেয়েটা আমার হারটা হারিয়ে নিশ্চয় খুবই মনোকষ্টে আছে! আমার মা-মরা মেয়েটার জন্যে কি তোমরা সম্মতি দিবে!

-অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

.

নবীজী হারটা আবুল আসের হাতে দিয়ে বললেন,

-যয়নবকে বলো, সে যেন মায়ের হারকে আর অবহেলা না করে।

.

এবার নবীজি আবুল আসকে নিয়ে এক কোণে গিয়ে কানে কানে বললেন,

-আবুল আস! আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, মুসলিম আর কাফিরের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলি। তুমি কি আমার মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিবে?

-জি দিবো। ফিরে গিয়েই পাঠিয়ে দিবো।

আবুল আস মক্কায় গিয়ে যয়নাবকে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। বিদায়ের সময় যয়নব বললেন,

-আপনিও আমার সাথে চলুন না। মুসলিম হয়ে?

-না।

Scanned with CamScanner

ভালোবাসার পরীক্ষা

একের পর এক প্রস্তাব আসতে শুরু করলো। লোভনীয় সব পাত্র। যয়নব দৃঢ়চিত্তে সব প্রস্তাব এড়িয়ে গেলেন। আশায় আশায় কেটে গেলো ছয়টা বছর। প্রাণের মানুষটা বুঝি এই এলো! কিন্তু আর আসে না! এতদিনের সংসার, মানুষটার কি একটুও মনে পড়ে না! বাচ্চাগুলোর কথাও বুঝি ভাবে না!

.

আবুল আস ব্যবসার কাজে শামে গেলেন। সেখানে কিছু সাহাবীর সাথে দেখা হলো। তাদের কাছে যয়নবের খোঁজ-খবর নিলেন। ফেরার পথে কী মনে করে, চুপি চুপি মদীনায় এলেন। ঠিক ফজরের আযানের আগ মুহূর্তে যয়নবের দরজায় টোকা দিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল বুঝি? যয়নব প্রথমেই প্রশ্ন করলেন,

-মুসলিম হয়ে এসেছেন?

-না, লুকিয়ে এসেছি।

-মুসলমান হবেন?

-না।

-ঠিক আছে, কোনও ভয় নেই। আমরা এখন স্বামী-স্ত্রী নেই। তবে খালাতো ভাই বোন তো আছি। আলী-উমামার পিতাকে স্বাগতম!

.

নবীজি ফজরের সালাম ফেরালেন। পেছন থেকে আওয়াজ এলো,

-আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিয়েছি।

নবীজি বললেন,

-আমি যা শুনেছি, তোমরা কি তা শুনতে পেয়েছ?

-জি ইয়া রাসূলাল্লাহ।

.

নবীজি আদরের বড় মেয়েকে বললেন,

-মা ভাইকে নিয়ে যাও। তবে মনে রেখো, সে তোমার জন্যে হালাল নয়। তার কাছে যেও না।

-জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!

.

Scanned with CamScanner

ঘরে এসে যয়নাব আবুল আসকে বললেন,

-আমাদের ছেড়ে যেতে কি আপনার একটুও কষ্ট হবে না? তার চেয়ে বরং ইসলাম গ্রহণ করে এখানেই থেকে যান না!

-না।

.

আবুল আস মক্কায় ফিরে গেলেন। প্রথমেই ব্যবসার শরীকদারদেরকে যার যার হিশেব বুঝিয়ে দিলেন।

.

আল্লাহর অসীম মহিমা। আবুল আস ফের মদীনার পথ ধরলেন। আগের মতোই ফজরের সময়।

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। নবীজি ভীষণ খুশি হলেন।

.

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি যয়নবকে ফিরে পাব?

-চলো দেখি!

.

-কই গো মা যয়নব! দেখো কাকে নিয়ে এসেছি! তোমার খালাত ভাই তোমাকে পুনরায় বিয়ে করতে আগ্রহী। তুমি কি সম্মত আছো?

মেয়ে আবার লজ্জায় রাঙা হলো। কিন্তু এবার তো স্নেহময়ী মা নেই। কার আঁচলে লুকোবেন?

.

এক বছর পর যয়নব মারা গেলেন। আবুল আস ভীষণ শোকাহত হলেন। মানুষ অবাক হয়ে দেখলো,

-নবীজি আবুল আসের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। প্রবোধ দিচ্ছেন জামাইকে। নিজের চোখেও পানি।

আবুল আস নবীজিকে বললেন,

-আল্লাহর কসম! ইয়া রাসুলাল্লাহ! যয়নব ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা আমার জন্যে খুবই কষ্টকর হবে!

.

স্ত্রীর শোক সইতে না পেরে এক বছর পর আবুল আসও মারা গেলেন।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৭

আমার সোনা বউ

জীবনটা বড়ই সুখে কেটে যাচ্ছিল। সুখের মূল উৎস আমার প্রাণাধিকা স্ত্রী। রিয়াদে পারিবারিক ব্যবসা ছিল। সেটার আয় দিয়ে মসৃণ গতিতে দিনগুলো গুজরান হয়ে যাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হয়ে গেছে। যে যার পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। ছোট ছেলেটা বাকী ছিল তাকেও আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়েছি। তারও একটা গতি হয়ে গিয়েছে সেখানে। পড়াশুনা শেষ করে মানানসই একটা চাকুরিও জুটিয়ে নিয়েছে।

আমার স্ত্রী একজন স্বামী অন্তপ্রাণা মহিলা। সে জন্মসূত্রে বেদুঈন। প্রথম দিকে আমার দায়িত্ব ছিল মরুভূমিতে আমাদের উটের পালের তদারক করা। সে সূত্রেই খাঁটি বেদুঈন জীবনের সাথে আমার পরিচয়। কৌতূহল নিয়েই মাকে দিয়ে বাবার কাছে একজন বেদুঈন মেয়ে বিয়ে করার কথা পেড়েছিলাম। বাবা অবাক হলেও গররাজি হননি। নিজেই যেচে পাত্রী খুঁজে বের করেছিলেন। জীবন আমার ফুলে ফলে ভরে উঠেছিল রওসাকে পেয়ে। কী অসম্ভব সরল আর কী অপূর্ব স্বাধীনচেতা ছিল সে। প্রথম প্রথম শহুরে জীবনের সাথে সে মোটেও খাপ খাওয়াতে পারতো না। মনটা হু হু করে ছুটে যেতো মরুচারী জীবনের সন্ধানে। তার কাছে ভাল লাগতো পরিশ্রম করতে। স্বামীকে ভালোবাসতে। স্বামীকে ঘিরে রাখতে।

তার স্বপ্ন ছিল অনেক সন্তানের মা হবে। মনে করতো দুনিয়াটা এখনো প্রাচীন বেদুঈন রীতিতেই চলছে। পুরো দুনিয়াটাকে সে তার বেদুঈন চোখ দিয়েই বিচার করতে চাইতো। সে চাইতো আমাদের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের নিচতলায় ছাগল পুষতে। ভেড়া পালতে। আমি হাসতে হাসতে খুন হয়ে যেতাম তার বোকাটে 'বদবী' ইচ্ছেগুলো শুনলে।

ব্যবসায়িক কাজে একটা কোম্পানীর সাথে চুক্তির জন্যে থাইল্যান্ড যেতে হলো। এক সপ্তাহের ট্যুর। রিয়াদ ফিরে মনে ও মননে এক ধরনের পরিবর্তন টের পেলাম। রওসাকে আগের তুলনায় বুড়ি বুড়ি মনে হতে লাগলো। যতই দিন গড়াতে লাগলো, রওসা আমাকে আবো বেশি করে ভালোবাসা দিতে শুরু করলো। এ যেন কুরআন কারীমের 'মাওয়াদ্দাহ-রহমত' (ভালোবাসা-অনুরাগ) এরই প্রতিফলন। রওসার বয়েস কতো হবে চল্লিশ বা তার

কমবেশ! কিন্তু আমার থাইল্যান্ড ঘুরে আসা চোখে অন্য ঘোর। মনে হতে লাগলো রওসা আশি বছরের বুড়ির চেয়েও থুত্থুরে হয়ে গেছে।

জীবনটাকে অন্যভাবে শুরু করতে ইচ্ছে জাগলো। ভেতরে ভেতরে পাত্রী খোঁজা শুরু করলাম। যেমনটা চাচ্ছিলাম সুন্দর এক তরুণীকে পেয়েও গেলাম। একদিন রওসার কাছে বিয়ের কথা পাড়লাম। অনুমতির জন্যে নয়, শুধু তাকে জানানো। তার মুখটা কালো হয়ে গেলো। সে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। তারপর ভেজা চোখে বললো,

-আবার বিয়ে করতে চাইলে আমার তো বাধা দেয়ার অধিকার নেই। আপনাকে শরীয়ত সে অধিকার দিয়ে রেখেছে। তবে আমার একটা প্রশ্ন ছিল!

-কী প্রশ্ন?

-নতুন বিয়েটা কি আমার কোনও ঘাটতির কারণে বা আমার প্রতি নারাজ হয়ে? জানতে পারলে নিজেকে সংশোধন করে নিতাম!

-নাহ তেমন কিছু নয়। তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে!

-বলুন, আপনার জন্যে যে কোন কিছুই আমি হাসিমুখে করতে পারবো! একটুও কষ্ট হবে না!

-তুমি কি কিছুদিনের জন্যে বড় ছেলের ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে পারবে?

-আমাকে বের করে দিচ্ছেন? আমার ত্রুটির কথা তো কিছুই বললেন না।

আমার মাথা তখন ঠিক নেই। কী থেকে কী হয়ে গেলো। রেগে গেলাম। রওসার পীড়াপীড়ি দেখে দুম করে বলে দিলাম,

-যা বলছি শোন!

রওসা কখনও যা করেনি, সেও রেগে গেলো। কথা কাটাকাটি হলো। এক পর্যায়ে সে রাগ করে আমার সামনে থেকে উঠে চলে গেলো। আমিও রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। রাতে ফিরে দেখি রওসা ঘরে নেই। খবর পেলাম সে সত্যি সত্যি বড় ছেলের বাসায় গিয়ে উঠেছে। আমার অহংকারে লাগলো। রাগে আমার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি চলে গিয়েছিল। রওসার আচরণ আমার কাছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনে হলো। অথচ আমিই তাকে বাসা ছাড়তে বলেছি। সে তো আমার হুকুমেরই তামিল করেছে। আমি ভেবেছিলাম সে ফোনে যোগাযোগ করবে। রেগে কথা বলার জন্যে আগে বেড়ে মাফ চাইবে। কিন্তু না, ফোন করলো না। অন্য কোনওভাবে যোগাযোগও করলো না। আমিও করলাম না।

Scanned with CamScanner

এদিকে বিয়ের তোড়জোড় চলতে লাগলো। সময়মতো বিয়েও হয়ে গেলো। অন্য কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। নতুন মুখের বন্দনায় বুঁদ হয়ে গেলাম। নববধূকে নিয়ে দেশের বাইরে থেকেও ঘুরে এলাম। দীর্ঘদিন হয়ে গেলো রওসার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই। অবাক হচ্ছিলাম সে আমার সাথে কথা না বলে কিভাবে থাকছে? এত দেমাগ কেন? সে তার অহংকার নিয়ে থাক। আসলে নতুনে মজে থাকায় সবকিছু ভিন্ন চোখে দেখছিলাম।

অনেকদিন পর বড় ছেলে দেখা করতে এল। আকারে ইঙ্গিতে মায়ের কথা বললো। সাফ বলে দিলাম,

-যার ব্যাপার তাকে সামলাতে দাও! তুমি কথা বলার কে?

বকা শুনে ছেলে কাঁচুমাচু হয়ে চলে গেলো। কিছুদিন পর ছেলে আবার তার ফুফুকে নিয়ে এল। আমি আগের মতোই গোঁ ধরে রইলাম। বোন রাগ করে বলল,

-তুমি বোধ হয় ভুল করছো। তাকে ঝুলিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছ!

-আমি ঝুলিয়ে রেখেছি?

-তো কী করেছ? ঘর ছাড়তে বলেছ! তার সাজানো সংসার ছেড়ে যেতে হুকুম করেছ!

-সেটা তো সাময়িক প্রয়োজনে বলেছি। তার কাছে খারাপ লাগতে পারে বলেই!

-সেটা খুলে বলেছ কখনো?

-সে সুযোগ পেয়েছি?

-আচ্ছা তর্ক থাক, তাকে ফিরিয়ে আনবে?

-সে নিজ থেকে আসলে বাধা দেব কেন? আর আসতে না চাইলে নিয়মিত তার খরচ দিবো নিয়মিত।

-সে তোমার এমন অবহেলার দান গ্রহণ করবে না!

-তাহলে আমার সাথে তার ঘর করারই বা কী দরকার?

-এই তোমার শেষ কথা?

-হ্যাঁ, শেষ কথা!

এরপর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এদিকে নতুন সংসারে যমজ বাচ্চা হলো। এই ঘর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মধ্যখানে আরেকবার বড়

Scanned with CamScanner

ছেলে তার ফুফুকে নিয়ে এসেছিল। একটা সমাধান চেয়েছিল। আবারও কথা কাটাকাটি হলো। শেষে রাগের মাথায় আমি অত্যন্ত ভয়ংকর ঘৃণিত কিছু শব্দ উচ্চারণ করে ফেললাম। আমার ছেলে বা বোন বিশ্বাস করতে পারছিল না আমি এমন শব্দ উচ্চারণ করতে পারি। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল।

এদিকে সন্তান হওয়ার আগে নতুন স্ত্রী যেমন আমার প্রতি মনোযোগী ছিল, মা হওয়ার পর তার সমস্ত মনোযোগ নবজাতকদ্বয়ের ওপর গিয়ে পড়লো। আমি এক ঘরে হয়ে পড়লাম। তৃতীয় বছরে পা দিয়ে সংসারে আবার নতুন মেহমান আসার লক্ষণ দেখা দিল। স্ত্রী তার মায়ের বাড়িতে চলে গেলো। কিছুদিন ওখানে থেকে আসবে। আমি বড় একা হয়ে পড়লাম। এই প্রথম রওসার কথা মনে পড়লো। কেন যে মনে পড়লো! সে কখনো আমাকে ছেড়ে একা মায়ের কাছে যায়নি। আমাকে সাথে করেই নিয়ে গেছে। অবশ্য আমি তাদের বেদুইন ঘরানায় অতটা খাপ খাওয়াতে পারতাম না। একদিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠতাম!

অনেক দিন হলো তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। একবারও খবর নিতে যাইনি। আসলে রাগ আর অহংকার আমাকে পশু করে দিয়েছিল। রওসাও কি একটু খোঁজ নিতে পারতো না? এখন আর হা-পিত্যেশ করে কী হবে? আমিই তো সব চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়েছি।

সংসারে তৃতীয় সন্তান আসার পর নতুন স্ত্রী আরও বেশি আত্মমুখী হয়ে পড়লো। আমার বয়েস তখন ষাট তার বয়েস ত্রিশ। আমি চিন্তাভাবনা করে বাচ্চা সামলানোর জন্যে একজন সার্বক্ষণিক আয়া রাখলাম। ভেবেছিলাম অবসর পেলে বউ আমার প্রতি মনোযোগ দেবে। ফল হলো উল্টো! ঘরে বাচ্চা সামলানোর চাপ কমে যাওয়াতে সে এবার বহির্মুখী হয়ে পড়লো। মায়ের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে দিল। নিত্য নতুন বান্ধবী জুটিয়ে তাদের সাথে ফোনালাপ জুড়লো। বাবা-ভাইয়ের অপ্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হলো। আরও নানা কিছু।

পদে পদে বুঝতে পারছিলাম, আমার কোথাও ভুল হয়েছে। নতুন বউকে প্রথম থেকে আমি কাছে টেনে রাখিনি। তার মনের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করিনি। তার সৌন্দর্যেই ডুবে ছিলাম। দু'জনের মধ্যে একটা মানসিক দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে। বয়সের তারতম্য কোনও বিষয় নয়। আমি চাইলে আবারও বিয়ে করতে পারি।

Scanned with CamScanner

একদিন বউ বাপের বাড়ি গেলে কৌতূহলবশত বোনের বাড়িতে গেলাম। বোন তো অবাক! অনেকদিন পর গেলাম তো তাই! সরাসরিই রওসার কথা জিজ্ঞেস করলাম।

-সে এখন ভাল আছে!

-ছেলের কাছে তো মা ভাল থাকবেই!

-ছেলের কাছে কেন? সে তার স্বামীর কাছেই আছে।

-স্বামী?

-কেন তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর পুরুষ নেই নাকি! তুমি তালাক দিয়েছ বলে কেউ তাকে বিয়ে করবে না, এমন কথা কোথাও লেখা আছে?

-কার সাথে বিয়ে হয়েছে?

-ছেলের প্রতিবেশী আবু ফাহদার সাথে।

-তার আগের স্ত্রী?

-সে মারা যাওয়ার পর আবু ফাহদা বড় একা হয়ে গিয়েছিল। আর তোমার বড় পুত্রবধূও রওসার মতো মানুষকে সহ্য করতে পারছিল না। বেচারী বড়ই কষ্টে আর অবহেলায় ছিল। এমন সময় সব জেনে শুনে আবু ফাহদাই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। রওসা প্রথম কিছুদিন না না করলেও, পুত্রবধুর জ্বালাতনে বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছে।

-আবু ফাহদা আমার বন্ধু হয়ে এমন কাজ করতে তার বিবেকে বাঁধলো না? তার সাথে আমার প্রায়ই দেখা হয়, এতকিছু হয়ে গেল কিছুই তো জানাল না!

-বিবেক? কার বিবেক? একজন অসহায় তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে টেনে ঘরে তুলেছে যে তার বিবেক নাকি যে ফেরেশতার মতো বউকে ছুঁড়ে ফেলেছে তার বিবেক?

দুনিয়াটা তেতো হয়ে গেলো। ঘরে এসে দু'দণ্ড শান্তি পাই না। বাইরে গেলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুরো সময়টা তীব্র এক অনুশোচনা কুরে কুরে খায়। এ আমি কী করলাম! মনকে শান্ত করার জন্যে ওমরায় গেলাম। হোটেলের রূম ঠিক করে বাইরে আসতেই দেখি আবু ফাহদা! ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম!

-তুমি?

-জি, ওমরা করতে এসেছি!

Scanned with CamScanner

জিজ্ঞেস করবো না করবো না করেও লাজলজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম,

-বিয়ে করেছ শুনলাম!

-জি!

-কেমন পেলে বউকে?

-তুমি বিয়ের পর আমাকে রওসা সম্পর্কে গল্প বলতে। আমি সবটা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন দেখি তুমি রওসা সম্পর্কে আসলে খুব কমিয়েই বলেছ!

আবু ফাহদার সাথে কথা বলে আমি আর দেরী করলাম না। সাথে সাথে রুমে এসে সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক হোটেলে থাকা সম্ভব নয়। যতবারাই দেখা হবে, মর্ম-পীড়া বেড়েই চলবে। তার চেয়ে পালিয়ে থাকাই উত্তম। অন্য হোটেলে রুম বুক করলাম। মক্কা ছেড়ে চলে আসার দিন শেষ বারের মতো তাওয়াফ করতে গেলাম। শেষ চক্কর দিয়ে মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দূরে দেখলাম আবু ফাহদা আসছে। তার সাথে রওসা! দুই রাকাত নফল পড়বো কি, সব ভুলে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। গুনাহ হচ্ছে সে কথা মনে রইল না। আবু ফাহদার কানে রওসা কী যেন বলছে আর আবু ফাহদা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে!

চোখের কোণটা জ্বালাপোড়া করে উঠলো। এক ঝলকে হাজারো স্মৃতি চোখের সামনে ফ্ল্যাশ করলো যেন! রওসা অনেক কিছুর ডাক নকল করতে পারতো। উটের ডাকা, ভেড়ার ডাক। ছাগলের ডাক। হায়েনার কান্না! তার মন ভাল থাকলে আর আমি মুখ গোমড়া করে থাকলে চুপিচুপি এসে আমার কানের কাছে এইসব ডাক ছাড়তো! তখন না হেসে থাকবে এমন সাধ্য কার! সাথে সাথে তাদের বেদুইন সমাজের মজার মজার বোকামীগুলোর গল্প বলতো!

পুরো বিশ্বটা আমার সামনে দুলে উঠলো। কী যে হারিয়েছি হেলায়! অহংকার আর গোঁয়ার্তুমি করে! এই হারানোর বেদনাই আমাকে তিলে তিলে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাবে! আল্লাহই একমাত্র শেফা দাতা। আমার সোনা বউ আজ অন্যের ঘরণী। বুঝতে পারলাম আসলে আমিই রওসার যোগ্য ছিলাম না। সে তো সতীন নিয়েও আমার ঘর করতে রাজি ছিল!

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প : ৪৫০

হি শী

এক.

শী: এক হাতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে কোলে নেয়, আরেক হাতে রুটি সেঁকে। রান্না করে। তরকারি কুটে। নাস্তা বানায়। অন্য সন্তানদের সামলায়। স্কুলের জন্যে তৈরী করে। ঘর ঝাড়ু দেয়।

.

হি: সামান্য একটা হাঁচি দিয়েই বিছানায় কাত। সাথে সাথে শুরু হয়, কোঁকানো। কাৎরানো। এটা ওটা আনার হুকুমের বহর। এই তরকারী খাব না। এটাতে ঝাল বেশি হয়েছে। আবার রেঁধে আন।

দুই.

শী: এক চোখ টিভিতে। দশ বছর ধরে চলা ধারাবাহিকে। পাশাপাশি একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানো। সাথে সাথে মেয়েকে বাড়ির কাজের অংক দেখিয়ে দেয়া চলছে। স্বামীর সাথে মৌখিক কথা চালাচালিও থেমে নেই। এর মাঝে দেরী করে ঘরে ফেরা কিশোরী কন্যাকে একচোট বকাবকিও হয়ে গেল। বকা থামানোর পর শুরু হলো স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বাপের বাড়িতে চলে আসা ছোট বোনকে বোঝানো-ভর্ৎসনা। এক ফাঁকে রাতের বেলার পুঁই শাকটা কোটা হয়ে গেছে।

.

হি: একটা পত্রিকা পড়ছেন। বসে বসে। একটু পর পর চিৎকার করে বলছেন:

-উফ! তুমি বকবকানি থামাবে? পত্রিকাটাও শান্তিতে পড়তে দিবে না?

তিন.

শী: সকালে শিক্ষকতার চাকুরিতে বের হয়। সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে। বিকেলে দৌড়ে দৌড়ে ফেরে। এসেই শুরু হয় রাতের রান্নার আয়োজন। হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়ের স্কুলেও একবার যেতে হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা খবর পাঠিয়েছেন। মেয়ে টিফিনের পর কার সাথে যেন ঘুরতে চলে যায়। বিকেলের

ক্লাশে নিয়মিত হাজির থাকে না। ফেরার সময় মায়ের বাড়িতেও একটা কদম ফেলে আসা হয়ে যায়। বাবার কোমরের ব্যাথা! এক্সরে রিপোর্টে কী এসেছে সেটা জানা দরকার ছিল। এবার স্বামী ঘরে ফিরলে। মুখে হাসি ঝুলিয়ে তাকে অভ্যর্থনা। রাতের খাবার পরিবেশন।

.

হি: সকালে ডিম পোচ আর ধূমায়িত চা পরিসেবন করে অফিসে। রাতের বেলা তিতিবিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে ফেরে। মুখে বসদের বিরুদ্ধে একশত একটা অভিযোগের পাহাড়। গোসলখানায় নরম তোয়ালে, গরম পানি সাজিয়ে রাখা। গোসল দিয়েই এক কাপ চা। একটু পর নবাবি চালে খাবার টেবিলে। ঘুম। নাকডাকা। ঘুরররর গুর।

কোনও কোনও দিন অফিস থেকে ফিরেই আড্ডায় বের হওয়া। রাত করে বাসায় ফেরা। ফিরে তরকারি একটু ঠাণ্ডা পেলেই,

- তোমরা ঘরে থেকে করোটা কী? আমার কষ্ট তোমরা একটুও বুঝতে চাও না!

চার.

শী: সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। নানা চিন্তার ভারে মাথা জট পাকিয়ে আছে। বাবার অসুখ। মেয়ের পড়াশুনা। ছেলেকে দাঁতের ডাক্তার দেখানো। ছোট খালার বিয়ের উপহার কেনা। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক মারা গেছেন তাদেরকে একবেলা খাবার পাঠানো। আগামী কালের রান্নাবান্না। ঘুমের দেখা নেই।

.

হি: বালিশে মাথা রাখার আগেই ঘুম। নাক ডাকার বিকট আওয়াজে বাড়ির সবার তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবেশিরাও ভয়ে জেগে ওঠে।

সকালে উঠেই প্রথম ডায়ালগ,

-উঁ উঁ আঁ আঁ গতরাতে এক ফোঁটা ঘুমও হয়নি!

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প: ৪৫১

তালাকনামা

একটা ছবি চোখে পড়লো। একজন পৌঢ়া মহিলা বসে বসে রুটি বানাচ্ছে। চুলায় আগুন জ্বলছে। একটা রুটি তাওয়ায় দেয়া, আরেকটা হাতে নিয়ে ময়দার গুঁড়ো ফেলছে। রুটি বেলার পিঁড়িটাতে সামান্য ময়দার গুঁড়া এলোমেলো পড়ে আছে।

বিষণ্ন চেহারা। চোখে অবাক দৃষ্টি। যা শুনেছে যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে:

-এতটা বছর একসাথে থাকার পর আজ একটামাত্র শব্দের ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়বো? তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সাধের সংসার মুহূর্তেই ভেঙে খানখান হয়ে গেলো? আমার এতদিনকার স্বপ্ন-সাধ-ভালোবাসা-মান-অভিমান সব মিছে হয়ে গেলো?

মহিলাটা যেন বলতে চাইছে:

–তুমিই তো আমার প্রথম প্রেম। তুমিই তো আমার সাধ-আহলাদ। তুমিই তো আমার জীবনের প্রথম শাহজাদা। তুমিই তো আমার প্রথম ভালোলাগা। এই শেষ বেলায় আমি কোথায় যাবো? কার কাছে আমার ঠাঁই হবে? বাবা-মা নেই। কোনও বোন নেই। ভাইয়েরা থেকেও নেই। আমি তোমাকে অবলম্বন করে বেঁচেছিলাম। তোমার হাত ধরে ঘর ছেড়েছিলাম। তোমার চোখ দিয়ে পথ চলেছিলাম। তোমার মাথা দিয়ে চিন্তা করেছিলাম। তোমার মন দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করেছিলাম।

***

সেই তুমিই আজ, এই পড়ন্ত বেলায়, এই ক্লান্তির সময়ে, এই গোধূলির ম্লান আলোয় আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ একটা নিষ্ঠুর শব্দের লাথি মেরে, একটা প্রাণঘাতী শব্দের ঝাঁটাপেটায়?

***

জানি আমার শরীরের আবছা বলি রেখাগুলো তোমার ভালো লাগে না। কিন্তু তিটি রেখার পেছনে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাটুকু তুমি টের পেলে না যে?

জানি তোমার ঘরে নতুন কেউ আসবে। কিন্তু আমাকে যে আর কেউ নিবে না?

ছবিটাতে দুই লাইনের একটা কবিতা লেখা,

"তালাক দে তো রাহে হো গুরুর ওয়া কহর কে সাথ
মেরা শাবাব ভী লোটা দো মেরে মহর কে সাথ"।

তালাক তো দিচ্ছ অহংকার আর প্রতাপের সাথে
আমার যৌবনটাও ফিরিয়ে দাও মহরানার সাথে।

(যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। সূরা তালাক : ৩)

জীবন জাগার গল্প :৪৫২

ঘোলাটে পানি

আমজাদ হোসেন। নতুনপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। একমাত্র মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছেন পাশের গ্রামে। আল্লাহ ছেলে ভালোই মিলিয়েছেন। গত কয়দিন ধরে, মেয়ে আর জামাই দুজনেই বারবার ফোন করে যেতে বলছে। আমজাদ আঁচ করতে পারলেন, দুজনের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে।

শফীক তার ছাত্র। কিছু বললে মেনে নিবে। এটা একটা ভরসার কথা।

আজ বৃহস্পতিবার। দুপুরে স্কুল ছুটি দিয়েই মেয়ের বাড়িতে চলে এলেন। এসেই দেরি করলেন না। দুজনকে নিয়ে বসলেন। ঘটনা তিনি যা ধারণা করে এসেছেন সেটাই। দুজনের মন কষাকষি।

দুজনকে বললেন,

-রান্নাঘরে গিয়ে দুজনে দুইটা গ্লাস নিয়ে এসো।

এসেছো? এবার পুকুরে যাও। আমার জন্য দুজনে দুই গ্লাস পানি নিয়ে এসো।

দুজন পানি আনতে গেলো। পানি না এনেই শূন্য গ্লাস হাতে ফিরে এলো।

-কী ব্যাপার পানি আনোনি যে?

-পুকুরে ছেলেরা দাপাদাপি করে গোসল করছে। পুরো পুকুরের পানিই কাদাময় ঘোলাটে হয়ে আছে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন খাবার দাবার কী আছে নিয়ে এসো। খাবার খাওয়ার পর এক খিলি পান মুখে দিয়ে আবার দু'জনকে পানি আনতে

Scanned with CamScanner

পাঠালেন। এবার দুজনেই দুই গ্লাস স্বচ্ছ পুকুরের পানি নিয়ে এলো।

-এবার দেখো, আগের বার গিয়ে স্বচ্ছ পানি আনতে পারোনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখা গেলো ঠিকই স্বচ্ছ পানি আনতে পারলে।

বাবারে! জীবনটাও এমনি, একসাথে থাকতে গেলে এমনি নানা কারণে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাবে। মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। দুজনের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হবে।

মা রে! একটু যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিস, তাহলে ঘোলাটে অবস্থা কেটে যাবে। স্বচ্ছ আর সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসবে।

জীবন জাগার গল্প : ৪৫৩

পরিশীলিত আচরণ

আদিল সাহেব অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই ঘুম থেকে উঠলেন। আজ তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে হবে। গত এক সপ্তাহ অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে থাকতে হয়েছে। বাসা-অফিস দু'জায়গাতেই অনেক কাজ জমে গেছে।

স্ত্রী-পুত্রের সাথে বসে নাস্তা সেরে নিলেন। আজ আর খেতে বসে বেশি কথাবার্তা হলো না। প্রতিদিন তো তিনজনের একটা ছোটখাট আড্ডাই হয়ে যায় বলতে গেলে। আজ হলো না।

অফিসটা বাসার কাছেই। যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। নাস্তা সেরে ব্যক্তিগত স্টাডিতে গিয়ে বসলেন। এক সপ্তাহ আর এখানে আসা হয়নি। টেবিলের উপর ধূলোর পুরু আস্তরণ পড়ে আছে। আদিল সাহেব ধূলোর উপরই আঙুল দিয়ে লিখলেন,

"আমি তোমাকে ভালোবাসি"

তিনি কামরা ছেড়ে বের হয়ে আসলেন। আসার সময় টেবিলের ওপর চাবির গোছাটা রেখে আসলেন। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সবসময়ই আসেন। হাসিমুখে বিদায় দেন।

দরজা খুলে বের হতে গিয়ে আদিল সাহেব বললেন,

-আমার চাবিটা ফেলে এসেছি স্টাডিরুমে। ওটা একটু এনে দিতে পারবে।

-জি, অবশ্যই।

Scanned with CamScanner

চাবি এনে - মুচকি হেসে- স্বামীর হাতে দিল।

অফিস থেকে ফিরে, রাতে স্টাডিতে গেলেন। টেবিলটা এখন ঝকঝকে-তকতকে। সেখানে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখা একটা চিরকুট দেখতে পেলেন। সেটাতে লেখা,

"আমিও"।

জীবন জাগার গল্প : ৪৫৪

দশটি নসীহত

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)। তার কথা মনে হলেই হৃদয়পটে ভেসে ওঠে আব্বাসী খলীফার দরবার। একজন বৃদ্ধকে হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে পেটানো হচ্ছে। আর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছেন,

-কুরআন কারীম মাখলুক নয়। আমাকে কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণ দাও।

.

অথবা হৃদয়পটে ভেসে ওঠে, একজন আলিম মসজিদে বসে হাদীস ও ফিকহের দরস দিচ্ছেন। হাজার হাজার ছাত্র তাকে ঘিরে রেখেছে।

.

এমন একজন মানুষ রোমান্টিকতার ওপরও ক্লাস নিচ্ছেন, প্রেম নিবেদন শেখাচ্ছেন, ভাবা যায়? এমনটা ঘটেছে বলে একটা বর্ণনা প্রচলিত আছে। যদিও কেউ কেউ মনে করেন ঘটনাটা ইমাম সাহেবের নয়। যারই হোক, একবার পড়েই দেখা যাক ঘটনাটা!

.

ইমাম সাহেবের ছেলের বিয়ের সব ঠিকঠাক। একদিন সময় করে পুত্রকে ডেকে পাশে বসালেন। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন:

--- ওয়ালাদী! তুমি কি সুখী হতে চাও?

- না'আম ইয়া আবী!

--- তাহলে তোমাকে তোমার হবু জীবনসঙ্গিনীর জন্যে দশটা বিষয় নিয়ে যেতে হবে।

-কী সেগুলো? কোথায় পাওয়া যাবে?

Scanned with CamScanner

--- তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। কিনতেও হবে না। আমার কাছে, তোমার কাছে, সবার কাছেই সেগুলো আছে। সবাই ব্যবহার করতে পারে না এই যা। তাহলে চলো দেখা যাক, অমূল্য সেই দশটা বিষয় কী?

প্রথম ও দ্বিতীয়: নারীরা সাধারণত রোমান্টিকতা পছন্দ করে। খুনসুটি-রসিকতা পছন্দ করে। নখরা-ন্যাকা তাদের স্বভাবজাত। তারা ভালোবাসার স্পষ্টপ্রকাশকে খুবই পছন্দ করে।

তুমি একান্তে তোমার স্ত্রীর কাছে এসব প্রকাশে কখনোই কার্পণ্য করবে না। তাকে বেশি বেশি ভালোবাসার কথা বলবে।

যদি এসবে কার্পণ্য করো, তাহলে দেখবে কিছুদিন পরই তোমার আর তার মাঝে একটা অদৃশ্য পর্দা ঝুলে গেছে। এরপর দিনদিন পরস্পরের সম্পর্কে শুষ্কতা আসতে শুরু করবে। ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালাবার পথ খুঁজবে।

তৃতীয়: নারীরা কঠোর-কর্কশ-রূঢ়-বদমেজাজী-রুক্ষস্বভাবের পুরুষকে একদম পছন্দ করে না। তোমার মধ্যে এমন কিছু থেকে থাকলে এখনই ঝেড়ে ফেল।

কারণ তারা সুশীল, ভদ্র, উদার পুরুষ পছন্দ করে। তুমি তার ভালোবাসা অর্জনের জন্যে, তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে হলেও গুণগুলো অর্জন করো।

চতুর্থ: এটা খুব ভাল করে মনে রাখবে, তুমি তোমার স্ত্রীকে যেমন পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, পরিপাটি, গোছালো, সুরুচিপূর্ণ, সুগন্ধিময় দেখতে চাও, তোমার স্ত্রীও কিন্তু তোমাকে ঠিক তেমনটাই চায়।

তাই সাবধান থাকবে, তার চাহিদা পূরণে যেন, কোনও অবস্থাতেই, তোমার পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়।

পঞ্চম: ঘর হলো নারীদের রাজ্য। একজন নারী নিজেকে সব সময় সেই রাজ্যের সিংহাসনে আসীন দেখতে খুবই পছন্দ করে। সে কল্পনায়, স্বপ্নে, বাস্তবে এই রাজ্য নিয়ে ভাবে। সাজায়। রচনা করে।

খুবই সাবধান থাকবে! কখনোই তোমার স্ত্রীর এই সুখময় রাজত্বকে ভেঙে দিতে যেও না। এমনকি তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়ার প্রয়াসও চালাবে না।

তুমি তো জানোই, আল্লাহ তা'আলার কাছে, সবচেয়ে অপছন্দজনক বিষয় কী?

-তার সাথে কোনও কিছু শরীক করা।

--- হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। একজন রাজার কাছেও সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় কী?

--- তার রাজ্যে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করা।

ষষ্ঠ: নারীরা তার স্বামীকে মনেপ্রাণে-সর্বান্তঃকরণে প্রবলভাবে স্বামীকে পেতে চায়। তবে পাশাপাশি বাপের বাড়িকেও হারাতে চায় না।

হুঁশিয়ার থেকো বাবা! তুমি ভুলেও নিজেকে আর স্ত্রীর পরিবারকে এক পাল্লায় তুলে মাপতে শুরু করে দিওনা। তুমি এ অন্যায় দাবী করে বসো না,

- হয় আমাকে বেছে নাও, নাহলে তোমার বাবা-মাকে।

তুমি এ বিষয়টা চিন্তাতেও স্থান দিও না। তুমি তাকে এমনটা করতে বাধ্য করলে, সে হয়তো চাপে পড়ে মেনে নিবে। কিন্তু তার মনের গহীনে কোথাও একটা চাপা-বোবা কান্না গুমরে মরতে থাকবে। তোমার প্রতি এক ধরনের সুপ্ত অশ্রদ্ধা তার কোমল মনে জেগে উঠবে।

সপ্তম: তুমি জানো, অনেক শুনেছ এবং পড়েছ নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাহু (বা পাঁজরের) বাঁকা হাড় থেকে। এই বক্রতা কিন্তু তার দোষ নয়, সৌন্দর্য। তুমি চোখের ভ্রু লক্ষ করে দেখেছো? সেটার সৌন্দর্যটা কোথায়?

- বক্রতায়।

--- একদম ঠিক কথা। বক্রতাই ভ্রুকে সুন্দর করে তোলে। ভ্রুটা যদি সোজা হতো, দেখতে সুন্দর লাগতো না।

যদি তোমার স্ত্রী কোনও ভুল করে ফেলে, অস্থির হয়ে রেগেমেগে হামলা করে বসো না। উত্তেজিত অবস্থায় তাকে সোজা করতে যেও না, তাহলে অতিরিক্ত চাপে ভেঙে যাবে। আর ভাঙা মানে বুঝই তো, তালাক।

Scanned with CamScanner

আবার সে অনবরত ভুল করে যেতে থাকলে, ভেঙে যাওয়ার ভয়ে কিছু না বলে লাগামহীন ছেড়েও দিও না। তাহলে বক্রতা যে আরও বেড়ে যাবে। নিজের ভেতরে গুটিয়ে যাবে। তোমার প্রতি আচরণ উদ্ধত হয়ে যাবে। তোমার কথায় কান দিবে না।

- তাহলে কী করবো?

---মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে।

অষ্টম: তুমি হাদীসটা পড়োনি?

-কোনটা আব্বাজান?

-ঐ যে, যার ভাবার্থ হলো:

= নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে যে, তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। তার প্রতি অতীতে কৃত সব সদ্ব্যবহার-সদাচার ভুলে যায়।

তুমি যদি তার প্রতি যুগ-যুগান্তরও সুন্দর আচরণ করো, হঠাৎ একদিন কোনক্রমে একটু রূঢ় আচরণ করে ফেলেছো, ব্যস অমনিই সে নাকের জল চোখের জল এক করে বলবে:

--- আমি তোমার কাছ থেকে কখনোই ভালো কিছু পাইনি।

দেখো বাছা! তার এই আচরণে রুষ্ট হয়ো না। তার এই চপল স্বভাবের প্রতিক্রিয়ায় তার প্রতি বিতৃষ্ণা এনো না।

তার এই স্বভাবকে তুমি অপছন্দ করলেও, তার মধ্যে তুমি অনেক এমন কিছু পাবে যা তুমি শুধু পছন্দই করো না, বরং জানও লড়িয়ে দিতে পারো।

নবম: নারীদের শরীর-মনের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। এক সময় এক রকম থাকে। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট একটা সময় তাদের শারীরিক দুর্বলতা থাকে। অনেক সময় মানসিক অস্থিরতাও বিরাজ করে। তাদের এই দুর্বলতা, অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দিষ্ট সময়ের নামায মাফ করে দিয়েছেন। রোযাকে পিছিয়ে দিয়েছেন, তার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ঠিক হওয়া পর্যন্ত।

তুমি তো রাব্বে কারীমের বান্দা। তুমিও তোমার রবের গুণে গুণান্বিত হও। রব্বানী হও। তুমি তোমার স্ত্রীর দুর্বল মুহূর্তগুলোতে তার প্রতি কোমল হবে।

Scanned with CamScanner

তোমার আব্দার-আবেগ শরমে রেখো। তোমার রবও খুশি হবেন, তোমার রাব্বাহও খুশি হবে। কৃতজ্ঞ হবে।

দশম: সবসময় মনে রেখো, তোমার স্ত্রী তোমার কাছে অনেকটা দায়বদ্ধ, বিভিন্নভাবে তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার সুন্দর আচরণের কাঙাল। তুমি তার প্রতি যত্নবান হবে। তার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিবে। তাকে আপন করে নিবে। তাহলে সে তোমার জন্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হবে। তাকে অনুপম সঙ্গী হিশেবে পাবে।

জীবন জাগার গল্প : ৪৫৫

শুকনো ফুল

বিয়ে হয়েছে বছর দুই হলো। বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে।

প্রত্যেকবারই মনোমালিন্য হলেও একটু পরেই আবার মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু এবার কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

ছেলে ইমাম সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলো। বৃদ্ধ ইমাম সাহেবকে যুবক বললো,

-হুযুর! স্ত্রী আমার প্রতি খুবই রাগ করে আছে। কোনভাবেই তাকে বোঝানো যাচ্ছে না। আমার কোনও কথাই শুনতে চাইছে না। আমি যে তার কাছে ভুল স্বীকার করবো সে সুযোগই দিচ্ছে না।

আমি এখন কী করতে পারি?

-তুমি একটা কথা বলো দেখি, তুমি যখন ফুলগাছে পানি দাও, তখন কী ঘটে?

- সেটা তাজা থাকে। গাছে থাকলে সেটা পুষ্টি পেয়ে আরো বড় হয়।

-আর যদি পানি না দিই?

-তাহলে ফুল শুকিয়ে যাবে।

-ফুল শুকিয়ে যাওয়ার পর পানি দিলে কী হবে?

- সত্যিকারর্থেই শুকিয়ে গেলে পানি দিলেও কোনও কাজ হবে না।

Scanned with CamScanner

- ঠিক বলেছো। পানি দিলেও শুকনো ফুল আর তাজা হবে না। সেটা অসম্ভব। আঘাত পেতে পেতে মানুষের মনের কোমল অনুভূতিগুলোও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। তখন শত কোমল কথা বললেও সেটা নরম হয় না। সেজন্য তোমার সতর্ক থাকা উচিত ছিলো। স্ত্রীর ছোট খাটো ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন ছিলো।

তুমি বোধহয় ছোটবড় সবকিছু নিয়েই সারাক্ষণ স্ত্রীর সাথে খিটিমিটি লাগিয়ে রাখতে। আস্তে আস্তে তোমার প্রতি তার কোমল অনুভূতিগুলো শুকিয়ে গেছে।

জীবন জাগার গল্প : ৪৫৬

সুলতানুল কালব

বাহির থেকে এসেই স্বামী স্ত্রীকে অযথা বকাবকি শুরু করে দিল। স্ত্রী কোনও উত্তর না নিয়ে চুপচাপ সব শুনে গেল। বদমেজাজী স্বামী এতে আরও রেগে গেল। এক পর্যায়ে বলল,

- তোমাকে একদণ্ডও সুখে থাকতে দিব না। আমার সাথে দেমাগ দেখাও না! জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়বো।

স্ত্রী এবার হেসে দিল। স্বামীর হাত ধরে বললো,

-আপনি তা কখনোই পারবেন না।

স্বামীর চোখ ছানাবড়া।

-কেন পারব না?

-প্রকৃত সুখ যদি সম্পদে হতো, তাহলে আপনি আমাকে সহজেই অসুখী করতে পারতেন। সুখ যদি স্বর্ণালঙ্কারে হতো, তাহলেও আপনার পক্ষে আমাকে অসুখী করা সহজ হতো। আমার প্রকৃত সুখ যে জিনিসে সেটা হরণ করার ক্ষমতা শুধু আপনার কেন, কোনও মানুষেরই নেই।

-কী সেটা?

-আমার প্রকৃত সুখ হলো আমার ঈমানে। আর আমার ঈমান আমার হৃদয়ে থাকে। আর আমার হৃদয়েশ্বর (সুলতানুল কালব) একমাত্র আল্লাহ।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প: ৪৫৭

ভালোবাসার রহস্য

বিয়ের পর দুই বান্ধবীর দেখা হলো। এ কথা সে কথার পর দু'জনের দাম্পত্য জীবন নিয়ে কথা উঠলো। শেষের দিকে এসে এক বান্ধবী জানতে চাইলো,

- তোমার স্বামী দেখি তোমাকে খুবই ভালোবাসে। এর কারণ কী? তোমাকে ছাড়া কি বিয়ে করার মতো আর মেয়ে ছিলো না? তোমার চেয়ে তো আরও সুন্দরী মেয়ে আছে!

-তুমি যা বলছো, সেটা সত্য। আমি মেনে নিচ্ছি। আমার চেয়েও সুন্দর মেয়ে আছে। আমার চেয়েও খোদাভীরু, গুণবতী মেয়ে আছে। তবে আমি কিছু কাজ নিয়মিত করি, তার কারণে হয়তো বা আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে।

এক: আমার স্বামীর কোনও আচরণে আমি কষ্ট পেলে তাকে ক্ষমা করে দেই।

দুই: তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাসায় ফিরলে তার দুঃখটা বোঝার চেষ্টা করি। তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনি।

তিন: তিনি আমাকে জামা-কাপড় উপহার দিলে তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করি।

চার: তিনি আমাকে কিছু না দিলে, আমি অল্পে তুষ্ট থাকি।

এভাবেই আমার আম্মু আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। বিদায়ের সময় আমার দাদু কয়েকটা কথা বলেছিলেন,

-নাতনি! আমার জীবনটা তোমার দাদাভাইয়ের সাথে কিভাবে কাটিয়েছি জানতে চাও?

-জি, দাদীমা!

-আমি কখনোই, তোমার দাদাভাইকে ভালোবাসা দিতে কুণ্ঠিত হইনি। আর অনুগত্য করতেও দ্বিধা করিনি।

= বোন! অন্যরা তোমার গায়ে কাঁটা যতই ফুটিয়ে দিক তুমি কিন্তু গোলাব চাষ বন্ধ করবে না।

জীবন জাগার গল্প: ৪৫৮

বুদ্ধিমতী বধূ

বাবা মায়ের পছন্দে হুট করে রাশাদের বিয়েটা হয়ে গেলো। বেশি খোঁজ খবর করার সুযোগ হয়নি। বিয়ের কিছুদিন পর রাশাদের মাথায় চিন্তা এল, ঘরে তো কাজকর্ম খুব বেশি নেই। রায়িফাকে কুরআন কারীম হিফয করতে বলবে।

রাশাদ প্রতিদিনই মাদরাসা থেকে ফিরে রায়িফাকে কুরআন হিফয করাতে শুরু করলো। মাশাআল্লাহ অগ্রগতিও বেশ ভাল হতে লাগল। এক উৎসব উপলক্ষ্যে রাশাদ বউকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গেল।

একদিন কী একটা প্রয়োজনে, রাশাদ শ্বশুর বাড়িতে তাদের থাকার কামরায় রাখা আলমারিটা খুলল। সেখানে তার পাঞ্জাবীগুলো তুলে রাখা আছে। পাঞ্জাবী নিতে গিয়ে মাঝারি আকারের সুন্দর একটা গিফট বক্সের ওপর চোখ পড়লো।

কৌতূহল দমাতে না পেরে রাশাদ বাক্সটা খুলে দেখলো। বাক্সের ভেতরটা নানা কাগজপত্রে ভর্তি। কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখে অবাক হলো। সবগুলোই বিভিন্ন সনদ-সার্টিফিকেট। রায়িফার হিফয শেষ করার সার্টিফিকেটও সেখানে আছে।

-আশ্চর্য তো! রায়িফা তুমি তাহলে হাফেযা। তাহলে এতদিন বলোনি কেন?

-আপনি তো কোনও দিন আমার কাছে জানতে চাননি আমি কুরআন হিফয করেছি কিনা। আপনি নিজ থেকেই ধরে নিয়েছেন আমি লেখাপড়া করিনি। আমি কুরআন পড়তে পারি না মনে করে আপনি আমাকে পড়াতে শুরু করে দিলেন। আমিও আপনাকে লজ্জা দিতে চাইনি। আমি দেখেছি, আমাকে পড়াতে আপনার ভালো লাগে। আপনি আমার না পারাটাকে উপভোগ করেন। তাই আর কিছু বলিনি।

-তাই বলে তুমি সবকিছু এভাবে চেপে যাবে?

-সত্যি বলতে কি, আপনি আমাকে পড়ান বলে আপনাকে বেশি সময় কাছে পাই। সাথে পাই। আবার আমি পড়া না পারলে আপনি আদর করে বোঝাতেন, উৎসাহ দিতেন। আর পড়া দিতে পারলে খুশি হয়ে সুন্দর সুন্দর হাদিয়া কিনে আনতেন। এসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চাইনি।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৫৯

বিরলতম স্বামী

ডাক্তার জেমস ওরল্যান্ড। জাতিতে স্কটিশ। ইংল্যান্ডের সানমেরি ক্লিনিকের সার্জন। এক মেডিকেল কলেজের এলমনাই অনুষ্ঠানে তাকে প্রধান অতিথি হিশেবে দাওয়াত দেয়া হলো। সেখানে ভাষণ শেষে প্রশ্নোত্তরপর্বে তাকে প্রশ্ন করা হলো,

-আপনার ডাক্তারি জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা বলুন তো!

-আমি মাসে একবার ভারতে যাই। হায়দ্রাবাদের একটা মেডিকেল কলেজে ক্লাস নিতে হয়। একটা চেম্বারেও বসি।

একদিন সকালের সেশনে চেম্বারে বসে আছি। রুগিদের প্রচণ্ড ভীড়। বিশাল লাইন। আবার একটা জরুরি অপারেশন করতে হবে। একজন বৃদ্ধ লোকের ভাঙা হাতকে জোড়া লাগাতে হবে। বৃদ্ধ লোকটার বয়েস আশি ছুঁই ছুঁই করছে। লোকটার নাম সুলেমান শেখ। এত বয়েস হয়ে গেছে, কিন্তু কথাবার্তা ও নড়াচড়ায় বেশ টনটনে-ছটফটে। চেম্বারে এসেই আমাকে বললো,

-স্যার! হাতের অপারেশনটা সারতে কি খুব বেশি সময় লাগবে? আমার এক জায়াগায় যেতে হবে।

বৃদ্ধের কথা শুনে আমার হাসি পেল। যেখানে আমার চেম্বারে সিরিয়াল পেতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়, সেখানে বৃদ্ধ আসতে না আসতেই চলে যেতে চাচ্ছে! আমি কৌতুক করে জানতে চাইলাম,

-এত তাড়াহুড়া কেন? বড় কোনও অফিসারের সাথে দেখা করতে যাবেন?

-না, এক পুনর্বাসন কেন্দ্রে যাবো।

-সেখানে কে থাকেন?

-আমার স্ত্রী।

-তিনি কেন সেখানে থাকেন?

-আজ পাঁচ বছর যাবৎ সে স্মৃতিভ্রংশ রোগে (আলঝেইমার) ভুগছে। সেজন্য তাকে সেখানে ভর্তি করানো হয়েছে। আমি প্রতিদিন দুপুরের খাবারটা তার সাথে খাই।

Scanned with CamScanner

-একদিন তার সাথে না খেলে কি কোনও সমস্যা হবে?

-না কিসের সমস্যা? সে তো গত পাঁচ বছর যাবৎ আমাকেও চিনতে পারে না।

-বলছেন কি, আপনাকে চিনতে না পারা সত্ত্বেও আপনি পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন দুপুরবেলা অসুস্থ স্ত্রীর সাথে খাবার খেয়ে আসছেন?

আমাকে অবাক হতে দেখে, বৃদ্ধ সুলাইমান শেখ মুচকি হেসে তার ভাল হাতটা দিয়ে আমার হাতের তালু ধরে একটু চাপ দিল। তারপর চোখ টিপে বললো,

-সে আমাকে না চিনলে কী হবে? আমি তো তাকে চিনি।

জীবন জাগার গল্প: ৪৬০

অবহেলা

মানসিক ডাক্তার: আপনার সমস্যা কি খুলে বলুন তো!

স্বামী: প্রচণ্ড কাজের চাপ আর অফিসের টাইট শিডিউলের কারণে আমি দিনদিন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছি। উদ্যম হারিয়ে ফেলছি। আমার স্ত্রী এক প্রকার জোর করেই আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। এখন ডাক্তার সাহেব একটা সমাধান দেন।

-আপনি কি কাজ করেন?

-ব্যাংকে চাকরি করি। ক্যাশিয়ার।

-আপনার স্ত্রী কি কাজ করে?

-সে কোনও কাজ করে না। ঘরে থাকে।

-প্রতিদিন সকালে আপনাকে এবং বাচ্চাদেরকে কে জাগিয়ে তোলে? আর সকালের নাস্তা কে তৈরি করে?

-আমার স্ত্রীই এসব করে। কারণ সে তো কোনও কাজ করে না।

-আপনার স্ত্রী প্রতিদিন কখন ঘুম থেকে জাগেন আর আপনি কখন জাগেন?

-ও তো আযানের সাথে সাথেই উঠে পড়ে। কারণ আমার অফিস আর বাচ্চাদের স্কুলের সময় হওয়ার আগেই সবকিছু গোছগাছ করতে হয় যে। আমি আরও অনেক পরে উঠি।

Scanned with CamScanner

-বাচ্চাদেরকে স্কুলে আনা নেয়া কে করে?

-এসব ওই করে। সে তো কোনও কাজে নেই।

-বাচ্চারা স্কুলে চলে যাওয়ার পর আপনাদের দু'জনের কাজ কি?

-আমি অফিসে চলে যাই। আর ও ঘরে থাকে। সে তো কোনও কাজে নেই। ঘরে থেকে দুপুরের খাবার রান্না করে, জামাকাপড় ধোয়, ঘর গোছায়।

-অফিস থেকে ফেরার পর আপনি কি করেন, আর আপনার স্ত্রী কি করেন?

-আমি খেয়েদেয়ে একটু গা এলিয়ে দিই। আর ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে। তাদের বাড়ির কাজগুলো দেখিয়ে দেয়। পড়াশুনার পাট শেষ হলে ও বিকেলের নাস্তা তৈরি করতে রান্নাঘরে যায়।

-তারপরে আপনার কি কাজ আর উনি কি করেন?

-আমি ব্যলকনিতে বসে পত্রিকায় চোখ বুলাই। কখনো কম্পিউটার নিয়ে বসি। বাচ্চাদের মা তখন রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত থাকে।

-তারপর?

-রান্নাবান্না শেষ হলে সবাই খেতে বসি। আমি শুয়ে পড়ি। আর ও বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে, থালা-বাসন পরিষ্কার করে, ঘরদোর গুছিয়ে আরাম করতে আসে।

-আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়?

আপনাদের দু'জনের মধ্যে ডাক্তারের প্রয়োজন কার বেশি?

আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার বিশ্রামের প্রয়োজন বেশি?

আর যে মানুষটা ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করে যায়, সেই বুঝি কোনও কাজ করে না!

যে মানুষটা কোনও নির্দিষ্ট অফিস টাইম ছাড়া কাজ করে, কোনও মাসিক বেতন ছাড়াই কাজ করে, কোনও প্রকারের চাপ ছাড়াই কাজ করে, কোনও প্রকারের উৎসাহ-প্রেরণা-কৃতজ্ঞতা ছাড়া, বিরক্ত হওয়া ছাড়া, অভিযোগ ছাড়া কাজ করে, সেই বুঝি কোনও কাজ করে না?

= ক্যাশিয়ার সাহেব!

-জি, বলুন ডাক্তার সাহেব।

- আপনার রোগ আমি ধরতে পেরেছি। আপনার রোগ হলো স্ত্রীকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৬১

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসগুলো উঠোনে ঘুরছে। সকাল বেলা পুকুরে যাওয়ার পর এখন কুঁড়ো খেতে এসেছে। নাবিলা তাড়াতাড়ি করে গোলাঘর থেকে কুঁড়ো এনে, ভাতের ফ্যান দিয়ে মাখিয়ে দিলো। হাঁসগুলোর খাওয়া শেষ হলো। সেগুলোকে তাড়িয়ে পুকুরের দিকে নিয়ে গেলো।

নাবিলা পুকুর পাড়ে আতা গাছটা লাগিয়েছিলো দেড় বছর আগে। বিয়ের ঠিক এক সপ্তাহ আগে। এখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে। গতকাল একটা লাঠি বেঁধে দিয়েছে। গাছটা এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই আতা গাছটাই এখন নাবিলার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। গত দেড়টা বছর তার জীবনের এক দুঃসহ স্মৃতি হয়ে থাকবে। কীভাবে যেন ঘোরের মধ্যেই দেড়টা বছর কেটে গেছে। আম্মু-আব্বু সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গেছেন।

নাবিলার আব্বু পাড়ার মসজিদের ইমাম। আব্বু অনেক আশা করে তাকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। দুই বছরের মাথায় তার পুরো কুরআন হিফজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এরপর কিতাব বিভাগে ভর্তি হয়েছিলো। লেখাপড়া খুবই ভালো হচ্ছিল। এর মধ্যেই দু'য়েক জায়গা থেকে বিয়ের কথা আসতে শুরু করলো। আব্বু প্রথমে না না করলেও শেষে রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়ে হলো প্রবাসী এক বরের সাথে। দিনগুলো স্বপ্নের মতোই কেটে যাচ্ছিলো। স্বামীর ছুটি ছিলো ছয় মাসের। বিয়ের চার মাসের মাথায় সংসারে নতুন মেহমানের আগমনি বার্তা এলো। সবাই খুশি।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটনা ঘটলো আরো পনের দিন পর। খালা শাশুড়ির বাড়িতে দাওয়াত ছিলো। রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী ঘরে ফিরছিলো। রিকশায় চড়ে। গ্রামের পথ রিকশায় হারিকেন ছিলো না। অন্ধকারে ঠাহর করে করে চালক রিকশা চালাচ্ছিলো। একটা ভাঙা পুল পার হওয়ার সময় রিকশার চাকাটা বেকায়দায় আটকে রিকশা উল্টে গেলো। নাবিলা রিকশা থেকে ছিটকে পড়লো। স্বামী তাড়াতাড়ি এসে তাকে ধরে দাঁড় করালো। নাবিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো,

—ওগো! আমার সব শেষ। আমার সব শেষ।

— কেন, খুব বেশি ব্যাথা লেগেছে?

Scanned with CamScanner

– না না, আমার শাড়িটা রক্তে ভিজে গেছে।

– কী বলছো তুমি? ইয়া আল্লাহ! রহম করো।

সাথে সাথে নাবিলাকে থানা হাসপাতালে নেয়া হলো। অত্যধিক রক্তক্ষরণে নাবিলা একদম নেতিয়ে পড়েছিলো। কর্তব্যরত ডাক্তার কিছু পরীক্ষা দিলেন। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে। দুই দিকের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এলো।

স্বামীর ছুটি ফুরিয়ে গেলো। অগত্যা অসুস্থ স্ত্রীকে রেখেই চলে যেতে হলো। স্বামী চলে যাওয়ার সময়ও নাবিল বিছানায় শোয়া ছিলো। মানসিকভাবে সে খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলো। স্বামীকে অনেক করে বলেছিলো,

– বিদেশে কি না গেলেই নয়? আল্লাহ দেশেই তো অনেক মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরও করবেন।

– এই শেষবার যাচ্ছি। এবার এলে আর যাবো না। একটু গুছিয়ে নিই।

– আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

– ভয়ের কী আছে? তুমি তো কুরআনের হাফেয। তুমিই তো আমাকে বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করতে।

স্বামী চলে যাওয়ার মাসখানেক পর থেকে নাবিলা অবাক হয়ে লক্ষ করলো, আস্তে আস্তে সন্তানের সম্ভাবনা ফুটে উঠছে।

প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ির কেউ বুঝতে পারেনি। পরে যখন বুঝতে পারলো, কানাঘুষা-ফিসফাস শুরু হয়ে গেলো। ডাক্তারি রিপোর্টে তো বলা হয়েছিলো বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে এখন?

কথাটা ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। যতই দিন গড়াচ্ছিলো, সবার কথার ধরণ পাল্টে যাচ্ছিলো। শাশুড়ি থেকে শুরু করে অনেকেরই ব্যবহার ক্রমশ অসহ্য থেকে অসহ্যতর হয়ে উঠছিলো। সবার কথা ধরে স্বামীও বিদেশ থেকে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলো। নাবিলা বারবার শাশুড়িকে বলছিলো,

– আম্মা! আমি কোন গুনাহ করিনি। আমি নিষ্পাপ।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। এ বাড়ির পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠলো। একদিন আব্বু এসে নাবিলাকে নিয়ে এলো। বাপের বাড়িতে এসে নাবিলা শামুকের মতো গুটিয়ে গেলো। পুরোটা সময় আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেই কাটাতে লাগলো। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। শ্বশুর

Scanned with CamScanner

বাড়ির ঘটনা কীভাবে যেন এখানেও জানাজানি হয়ে গেল। সবাই বিশ্বাস করে বসলো। এখানেও আড়ালে-আবডালে আলোচনা শুরু হয়ে গেল,

– আরে ইমাম সাহেবের মেয়েই যদি এমন হয়, তাহলে আমাদের কী হবে? এমন ইমামের পেছনে নামাজ পড়াটা কি ঠিক?

কিছুদিন পর কথাটা প্রকাশ্যেই আলোচিত হতে লাগলো। কমিটি মিটিং ডেকে ইমাম সাহেবকে সাসপেন্ড করলো। এরই মধ্যে একদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে তালাকনামা এলো। স্বামী বিদেশ থেকেই স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। নাবিলা একদম ভেঙ্গে পড়লো। ভাবলো,

– মানুষটা একটাবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলো না? শুধু অন্যদের কথা শুনেই তালাকনামা পাঠিয়ে দিলো? পাঁচ মাসের এত ভালোবাসা এত আন্তরিকতা সব মিছে হয়ে গেলো?

নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর নাবিলার একটা কন্যা সন্তান হলো। নাবিলার বড় ভাই বিদেশে থাকতো। পরিবারের এই দুঃসময়ে দেশে এলো। ভাই এসেই বোনের পাশে দাঁড়ালো। সান্ত্বনা দিয়ে বললো,

– বোন! তুই যদি হকের ওপর থাকিস তাহলে কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ সবকিছু দেখেন, জানেন। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ তোর সাথেই আছেন। তুই একজন কুরআনের হাফেযা। কুরআনের সম্মানে হলেও আমি প্রমাণ করে ছাড়বো যে তুই নিষ্পাপ। এখন অনেক ধরনের পরীক্ষা বের হয়েছে। সন্তানের পিতা কেন, তার চৌদ্দগুষ্ঠি সুদ্ধ বের করা যায়। পরীক্ষাটার নাম ডিএনএ টেস্ট। তোকে আমি ঢাকা নিয়ে যাবো। ওখানেই পরীক্ষাটা করা যাবে। যত টাকাই লাগুক।

পরীক্ষার পর জানা গেলো। এই সন্তান আগের স্বামীর ঔরসজাত।

বড় ভাইয়ের প্রাণান্ত চেষ্টায় নাবিলার নতুন করে বিয়ের ব্যবস্থা হলো। নতুন বরকে সবকিছু জানানো হলো। তিনি সব জেনেশুনেই রাজি হলেন। বিয়ের দিন-তারিখ পাকা হলো। এদিকের সব খবর জানতে পেরে আগের স্বামী পড়িমরি করে বিদেশ থেকে ছুটে এলো। নানাভাবে নাবিলাকে নতুন করে বিয়ের জন্য চেষ্টা করলো। নাবিলা এক কথায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

– যে মানুষ অন্যের কথা শুনে নিজের সন্তানকে অস্বীকার করে, তার ঘর করার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক সুখের।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প: ৪৬২

বিয়ের আইন

স্বামী বিকেলে ঘরে ফিরলো। গোমড়ামুখে। বিষণ্নচিত্তে। অন্যদিনের মতো স্ত্রী দরজা খুলে দাঁড়ালে সালামও দিলো না।

বাইরের পোশাক ছাড়লো না। জুতো খুললো না। কারো সাথে কোনও কথা না বলে চুপচাপ ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথায় হাত রেখে উহ-আহ! করতে লাগলো।

স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়ালো। জানতে চাইলো:

-কী হলো, কোনও সমস্যা হয়েছে? খাবার বেড়েছি। হাতমুখ ধুয়ে আসো। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

-না, খাবো না।

-কী হয়েছে, আমাকে বলবে তো।

-না না, কিছুই হয়নি। এখন পাশ থেকে যাও।

-আহা! কী হয়েছে আমাকে তো অন্তত বলতে পারো। আমি হয়তো সহযোগিতা করতে পারবো।

-বললাম তো বাবা, কিছুই হয়নি।

-কিছু না হলে অমন করে শুয়ে আছো যে বড়! আমাকে বলেই দেখো না। কোনও না কোনও সাহায্যে আসতেও তো পারি।

-তুমি আমাকে কী দিয়ে সাহায্য করবে?

-তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য আমার জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি। আমার কাছে তোমার চেয়ে দামি আর কেউ আছে? তুমি সমস্যাটা খুলে বলো।

-তুমি থাকো সারাক্ষণ ঘরে। এটা হলো বাইরের ব্যাপার। সমস্যাটা হলো একটা রাষ্ট্রীয় আইন।

-আমাদের মতো ছা পোষা মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন কিসের সমস্যা?

-সমস্যা মানে? জীবনমরণ সমস্যা। গতকাল একটা আইন জারি হয়েছে, "যাদের ঘরে একটা বউ আছে, তারা যদি আরেক বিয়ে না করে, তাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।"

এখন তুমিই বলো, বউ! তুমি কি চাও আমি ফাঁসিতে ঝুলি?

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৬৩

সাইকেল-প্রেম

'ওর' খুব ইচ্ছে সাইকেল চড়বে। বারবার বলছিলো। ঘ্যানঘ্যান করছিলো কানের কাছে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? কড়া পর্দানশীন একটা মেয়েকে কিভাবে সাইকেলে ডাবলিং করে ড্যাং ড্যাং করে রাস্তায় বেরোই?

***

এক চাঁদনী রাতে, দু'জনে মিলে ঠিক করলাম, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সাইকেল নিয়ে পুকুর পাড়ের চারপাশটা ঘুরিয়ে আনবো।

চুপি চুপি বের হলাম। সাইকেল অভিসারে। সাইকেলটাকে একটা নারিকেল গাছের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালাম। ওকে পাঁজাকোলা করে সাইকেলে বসিয়ে দিলাম। এবার আমার কেরদানি দেখানোর পালা।

***

সাইকেলে উঠে যেই প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করলাম, ও হাউমাউ করে বলতে শুরু করলো,

-ও গো! ভয় লাগছে।

-নো নো, কোনও কথা নেই। চড়তে চেয়েছ। শখ মিটিয়ে চড়ে নাও। টাইট হয়ে বসে থাক।

***

যে জীবনে সাইকেল চড়েনি, সে কিভাবে সুস্থির হয়ে বসবে। ও খালি নড়াচড়া করতে লাগলো। সেই নড়াচড়ার মাত্রা আস্তে আস্তে বেড়েই চলছিলো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম ও যেভাবে নড়াচড়া করছে, না জানি পুকুরেই পড়ে যাই। ও একা হলে কথা ছিল না। ও যে তখন আরেকজনকে বহন করছিল!

***

পুকুর পাড়টা একপাক ঘুরে আরেক পাকের জন্যে মোড় ঘুরতে যাচ্ছি এমন সময় কোত্থেকে একটা শিয়াল সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল। হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে বাঁধলো বিপত্তি! একেবারে বিনে পয়সায় গোসল!

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প: ৪৬৪

বাবার আদর

স্বামী ছোট্ট মেয়ের সাথে খেলা করছে। স্ত্রী অনেকক্ষণ দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে এক সময় কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে পাশে বসে খেলায় যোগ দিল। একটু পরে খেলাচ্ছলে স্বামীকে শুধালো,

-আমাদের এই সোনামণিটার একদিন বিয়ে হবে। আমাদের ছেড়ে চলে যাবে স্বামীর ঘরে।

-এমন খুশির মুহূর্তে তুমি আগাম কষ্টের কথা কেন কল্পনা করছো। আমি তো সেদিনের কথা ভেবে এখনো কাঁদি।

-আচ্ছা, আপনার মেয়েকে যদি তার স্বামী কষ্ট দেয়, কাঁদায়, আপনার কেমন লাগবে?

-আমি সেই বজ্জাতের টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলব। এত বড় সাহস! আমার মেয়েকে কষ্ট দিবে?

স্ত্রী একটু চুপ থেকে বললো:

-আপনার মতো আমার আব্বুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনিও এমন কথা বলতেন।

= স্বামী নির্বাক হয়ে স্ত্রীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

জীবন জাগার গল্প: ৪৬৫

ক্ষমার রবার

কয়েকদিন পর বিয়ে। বাড়িতে সাজসাজ রব। সবকিছু ধোয়া মোছা হচ্ছে। ঝাড়াই-বাছাই চলছে। দলাই-মলাই চলছে। দেয়ালে চুনকাম করা হচ্ছে।

.

নাতির বিয়ে, দাদাও খুশি। তারও কিছু করণীয় আছে। একরাতে নাতিকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

Scanned with CamScanner

-দুইটা কাগজ নিয়ে আসো। সাথে একটা পেন্সিল আর রাবারও আনবে।

-দাদাজী! রাবার তো নেই। কাগজ আর পেন্সিল আছে।

-তাহলে যাও পাড়ার দোকান থেকে একটা রাবার কিনে আন।

.

ঠিক আছে, এবার দুইটা কাগজেই কিছু একটা লিখ।

-কী লিখব?

-যে কোনও একটা বাক্য লিখ। তোমার যা খুশি।

-লিখেছি।

-রাবার দিয়ে একটা কাগজের লেখা মুছে ফেল। আরেকটার লেখা রেখে দাও।

-মুছেছি।

-আবার উভয় কাগজে লিখ।

-লিখেছি।

-এবারও একটা কাগজের লেখা মোছ। আরেকটার লেখা আগের মতোই আমোছা রেখে দাও।

-ওহহো! তুমি আসলে কী চাচ্ছ, খুলে বলো তো!

-যা বলছি তাই করো।

-জি, দাদাভাই! মুছেছি।

.

-দেখ তো, লেখামোছা কাগজটাতে কোনও দাগ আছে?

-জি না, নেই। ভাল করে মুছেছি। কিন্তু বিষয়টা কী, খুলে বলো না!

-দেখো ভাই! তুমি তো বিয়ে করতে যাচ্ছ। বিয়ের পর, তোমার সাথে ঠিক এমনি 'ক্ষমার রবার' না রাখলে তোমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসা অপছন্দনীয় কথা-আচরণগুলো মুছতে পারবে না। কয়দিন পরই দেখবে, তোমার অন্তরটা বিভিন্ন কষ্ট-অসন্তোষের দাগে কালো হয়ে যাবে। যেমনটা না-মোছা কাগজে দাগগুলো রয়ে গেছে।

Scanned with CamScanner

এই কালো দাগগুলো জমতে জমতে এক সময় পুরো অন্তরটাই মরে যাবে। দুজনের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা বলতে কিছুই থাকবে না।

.

তুমি ভাই, সবসময় ক্ষমা ও সহনশীলতার রবার সাথে নিয়ে ঘুরবে। স্ত্রীর কাছ থেকে কোনও অপ্রীতিকর আচরণ এলেই মন থেকে তার ছাপ ঘষে তুলে ফেলবে। তাহলে দেখবে, কখনোই দুজনের মধ্যে দেয়াল উঠতে পারবে না।

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৬৬

পুতুল বিক্রি

দু'জনের দাম্পত্য জীবনের বয়েস ষাট বছর পার হলো। এতদিন এক সাথে, এক ঘরে, এক খাটে কাটানোর পর দুজনেই এখন বলতে গেলে এক দেহ, এক মন। একজনের কোনও ব্যাপারই আরেকজনের অগোচর নয়। আড়াল নয়।

.

এ দীর্ঘ সময় অত্যন্ত সুখে কেটেছে, দু'জনের। একে অপরের সেবা করে, একজন আরেকজনের সুবিধা-অসুবিধের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ঘর-সংসার করেছে।

.

দু'জনের মধ্যে আড়াল করার মতো, গোপন করার মতো, লুকোচুরি খেলার মতো কিছুই ছিল না। শুধু একটা বিষয়। স্ত্রী প্রথম দিন থেকেই একটা বাক্স অত্যন্ত যত্নের সাথে আলাদা করে রেখেছিল। ওটার ভেতরে কী আছে স্বামীকে দেখতে দেয়নি। প্রথম প্রথম স্বামী কৌতূহল দেখিয়েছে। অভিমান করেছে। তবুও বউ টলেনি।
বাক্সটা একান্ত নিজের করে আড়ালে রেখেছে। স্বামীও পরে মেনে নিয়েছেন। স্ত্রীর একান্ত বিষয় মনে করে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন।

.

বয়েস হয়েছে। বুড়ির শরীরে নানা রোগ-বালাই বাসা বেঁধেছে। শত চিকিৎসাতেও কাজ হলো না। ডাক্তার শেষ কথা বলে দিয়েছেন। আর মাত্র ক'টা মাসই হয়তো বাঁচবেন। আর কোনও আশা নেই। বুড়ো উদ্ভ্রান্তের মতো

Scanned with CamScanner

হয়ে গেলেন। স্ত্রী হারানোর আগাম শোকেই অর্ধেক কাহিল হয়ে পড়লেন। তবুও মনে পাথর বেঁধে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। স্ত্রীর শিয়রে চব্বিশ ঘন্টা ঠায় বসে বসে সেবা করে গেলেন।

বুড়ির অবস্থা দিনদিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বুড়ি একদিন রাতে টলটলে স্যুপ খেতে খেতে বললেন:

-ওগো! আমার তো চরম অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমাকে তো একটা বিষয় বলা বাকি রয়ে গেছে।

-কী, সেটা?

-মনে নেই আমার একটা বাক্স ছিল!

-হ্যাঁ, হ্যাঁ।

-আলমারি খুলে সেটা নিয়ে আস। খুলে দেখ।

-ভেতরে তো দেখি ছোট দুইটা কাপড়ের পুতুল আছে। পাশেই সুই-সুতো রাখা।

-তুমি পুতুল দু'টো উঠিয়ে হাতে নাও। তারপর দেখ।

-ওমা! এখানে তো দেখি অনেক টাকা।

-না, অত বেশি কোথায়! পঁচিশ হাজার মাত্র।

-আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। পুতুল, সুই-সুতো, টাকা! হেঁয়ালী না করে খুলে বলো!

-দেখো! আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের আগের রাতে দাদু আমাকে নিয়ে শুয়েছিলেন। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলেছিলেন,

-জানিস ছোটবু! সুখময় দাম্পত্য জীবনের রহস্য কী?

-আমি কী করে জানবো? সেটাতো জানবে বুড়ি! তুমি।

-তাহলে শোন! সফল দাম্পত্য জীবনের রহস্য একটাই কুরবানি দেয়া

-কী কুরবানি দাদু? পশু?

-না রে ছোটবু, না।

= ঝগড়া-বিবাদ কুরবানি করা।

.

দাদু সে রাতে আরও বলেছিলেন,

Scanned with CamScanner

-শোন ছোটবু! যখনই তুই বরের ওপর রাগ করবি, রাগটাকে যত কষ্টই হোক দমিয়ে রাখবি। প্রকাশ করবি না। পরে স্বামীর আড়ালে গিয়ে সুই-সুতা দিয়ে একটা পুতুল তৈরী করবি।

.

বুড়ো স্বামীর চোখে এবার অশ্রুর তুফান শুরু হলো। ধরা গলায় বললেন,

-শাফিয়া! তুমি সারাজীবনে মাত্র দু'বার আমার ওপর রাগ করেছ?

বুড়োর কান্না এলেও মনে খুবই আনন্দ বোধ করছিল। সারা জীবনে মাত্র দু'বার স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছে। ক'জন আছে তার মতো এমন ভালো স্বামী? আরেকটা খটকা রয়ে গেছে।

-আচ্ছা শাফু! পুতুলের ব্যাপারটা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু টাকার ব্যাপারটা?

-এই পঁচিশ হাজার টাকা আমি পুতুল বিক্রি করে জমিয়েছি।

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৬৭

বউমাপা দাঁড়িপাল্লা

বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে। ছেলের মনে ভয়।

-যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে আমাকে ভালোবাসবে তো? চারপাশে যা দেখছি, তাতে তো বিয়ে করতে এক প্রকার ভয়ই করছে।

কথা প্রসঙ্গে বিষয়টা নিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইল। হুযুর সব শুনে বললেন,

-সবার দাম্পত্যজীবনই যে অসুখী হয় এমনটা তো নয়। তুমি ভাল থাকলে, তোমার জীবনসঙ্গিনীও ভাল থাকবে। তবে তোমাকে আমি একটা মানদণ্ড দিতে পারি।

-কিসের মানদণ্ড?

-যেটা দ্বারা তুমি তোমার স্ত্রীকে মাপতে পারবে।

-কোন বিষয়ে মাপবো?

-সে তোমাকে ভালবাসে কি না।

-জ্বি বলুন। তাহলে তো ভালোই হয়। দু'জনের ভুলগুলো ধরা পড়লে শোধরানো সহজ হবে।

Scanned with CamScanner

-তাহলে শোন। বিয়ের পর খেয়াল করবে; যদি তোমার স্ত্রী চৌদ্দটা কাজ করে, তাহলে ধরে নিবে সে তোমাকে ভালবাসে।

এক. যদি তোমার অবর্তমানে সে তোমার কথা আলোচনা করতে, তোমার সম্পর্কে শুনতে আগ্রহবোধ করে, অথবা তোমার মুখ থেকে তোমার জীবনের গল্প শুনতে ভালবাসে এবং তুমি যাদেরকে ভালবাসো, সেও যদি তাদেরকে ভালবাসে, তাহলে তুমি চোখ বুজে ধরে নিতে পারো, তুমি একজন স্বামী সোহাগিনী (উরুবান) স্ত্রী পেয়েছ।

.

দুই: তুমি তার মতের বিপরীত কাজ করলে, তার সাথে কোনও বিষয়ে একমত না হলেও, যদি সে রাগ না করে, গাল ফুলিয়ে না থাকে, তাহলে ধরে নিবে তুমি একজন ভাগ্যবান স্বামী।

.

তিন: তোমার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখে সেও যদি সমব্যথী-সতীর্থ হয়, তাহলে বোঝা যাবে সে একজন স্বামীপরায়ণা স্ত্রী।

.

চার: যদি দেখ সে নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে তোমার সাথে কথা বলে বিষয় খুঁজে না পেলে, বানিয়ে বানিয়ে হলেও ছুতো ধরে তোমার সাথে কথা বলার উপায় খোঁজে, তাহলে সে একজন স্বামী-অন্তপ্রাণ স্ত্রী।

.

পাঁচ: যখনই কোনও নতুন কাজ শুরু করে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তোমার সাথে পরামর্শ করে, তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি একজন পতিব্রতা স্ত্রী পেয়েছ।

.

ছয়: যত কমদামিই হোক, তুমি তাকে কোনও উপহার দিলে সে দু'হাতে সে উপহার বড় মনে গ্রহণ করে, পরম উৎফুল্ল হয় তাহলে তুমি শুধু আদর্শ স্ত্রীই পাওনি, একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীও পেয়েছ।

.

সাত: যদি সে সর্বদা তোমাকে ভারমুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে, আগ বাড়িয়ে তোমার টুকিটাকি কাজগুলো করে দেয়, তাহলে তোমার ইহজীবনটা জান্নাতেই কাটবে চোখ বুজেই এটা মেনে নিতে পারো।

Scanned with CamScanner

·

আট: তোমার অনুপস্থিতি যদি তাকে উৎকণ্ঠিত করে রাখে, বারবার ফোন করে, মেসেজ পাঠিয়ে তোমার খোঁজ-খবর করে, তাহলে ধরে নাও, তুমি একজন ফিরিশতাকে পেয়ে গেছ।

·

নয়: তুমি পছন্দ করো এমন কাজ যদি সে আগ বাড়িয়ে করে এবং তুমি পছন্দ করো না, এমন কাজ যদি সযত্নে পরিহার করে চলে, তাহলে তুমি নির্ভার থাক তুমি সুখী একটা জীবন কাটাতে যাচ্ছ।

·

দশ: তোমার স্বভাবের বিশেষ দোষ-ত্রুটি-খুঁত যদি তাকে বিরক্ত না করে, রাগিয়ে না দেয়, তাহলে তুমি সর্বকালের সেরা একজন বন্ধু পেয়ে গেছ।

·

এগার: যদি সে তোমার জন্যে যে কোনও ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে এক পায়ে প্রস্তুত থাকে, তাহলে সুখময় একটা জীবনই তোমার সামনে অপেক্ষা করছে।

·

বার: যদি সে তোমার চিন্তার জগতে আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করে, যেসব বিষয়ে তোমার মনোযোগ সেও যদি তাতে আগ্রহী হয়, তোমার শখের বিষয়গুলোর প্রতি সেও যত্নবান হয়, যদি তোমার কল্পনাজগতের সাথেও সে একাত্ম হয়, তাহলে তোমার চেয়ে সুখী ইহজগতে আর কেউ হতে পারে না।

·

তের: যদি সে তোমার জন্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও লাজ-সংকোচ ছাড়া করতে পারে, নির্দ্বিধায় করে ফেলে, তাহলে তোমার উচিত আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা।

·

চৌদ্দ: যদি সে তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে, ইবাদত-বন্দেগীতে, পাপমুক্ত জীবন-যাপনে সহযোগিতা করে, উৎসাহ যোগায়, তাহলে তুমি এমন কিছু পেয়ে গেছো, যা তোমাকে দুনিয়াতেও জান্নাতী সুখের সন্ধান দিবে, আখিরাতেও জান্নাতী জীবন লাভের নিশ্চয়তা দিবে।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প: ৪৬৮

জামাই-শিক্ষা

নতুন জামাই। শ্বশুর বাড়িতে এলো। শাশুড়ীর ইচ্ছা জামাইয়ের হাঁড়ান-গাঁড়ান, বুদ্ধিশুদ্ধি যাচাই করে দেখবেন। কেমন পরিশ্রম করতে পারে তাও পরীক্ষা করবেন।

পরদিন ধান কাটতে পাঠলেন। ক্ষেতে আগাছা বেশি ছিলো। অলস জামাই সামান্য ধান কেটেই চরে এলো। অজুহাত দিলো, জমিতে আগাছা বেশি। ধান কাটা যায় না। বেছে বেছে ধান কাটা অনেক ঝক্কির ব্যাপার।

রাতে জামাইকে ভাত দেয়া হলো। শাশুড়ী নিজেই ভাত বেড়ে দিলেন। জামাই খেতে বসে দেখলো, প্লেটে শুধু একগাদা ভাত দেয়া আছে। কোনও তরকারি নেই। নতুন জামাই মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না। আবার শুধু শুধু ভাত কিভাবে খাবে সেটাও বুঝতে পারছে না।

শাশুড়ীও অন্য কাজে ব্যস্ত। শেষে ক্ষিধের জ্বালায় আর থাকতে না পেরে সাদা ভাতই খাওয়া শুরু করলো। লবণ দিয়ে ভাত মাখাতে গিয়ে দেখে, ভাতের ভেতরেই একপাশে শাক, একপাশে মাছ, একপাশে গোশত দেয়া আছে।

জামাই তরকারিগুলো আলাদা আলাদা করে রেখে ভাত খাওয়া শুরু করে দিলো।

ভাত খেয়ে উঠলে শাশুড়ী বললেন:

-ভাত যেভাবে তরকারি থেকে আলাদা করে করে খেয়েছো, আগামীকাল জমির ধানও সেভাবে বেছে বেছে কাটবে। তাহলে সহজেই ধান কাটা হয়ে যাবে।

জীবন জাগার গল্প: ৪৬৯

স্বপ্নময় বিয়ে!

শুধুই আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্যে বিয়ে করে, দুনিয়াবী কোনও স্বার্থতাড়িত হয়ে নয়। এমন বউ-জামাই-শ্বশুর কি বর্তমানে আছে? সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহ.)। তার মেয়ের বিয়ের ঘটনা তেমনই একটা।

Scanned with CamScanner

বাবার কাছেই কুরআন-হাদীসের পাঠ নিয়েছেন। মেধা ভাল থাকায় অল্পদিনে ঘরে বসেই অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেলেন। বাবাও মেয়েকে মনপ্রাণ উজাড় করে শেখালেন। বুযুর্গ বাবার সন্তান, ঘরেও আমলের পরিবেশ। বাবার দেখাদেখি মেয়েও সেভাবে তাকওয়া-পরহেজগারীতে অভ্যস্ত হয়ে বেড়ে উঠলো। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

.

বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করলো। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানও প্রস্তাব পাঠালেন। ছেলে ওলীদের জন্যে। যিনি পরবর্তীতে খলীফা হবেন। খলীফার প্রস্তাব নিয়ে দূত মদীনায় এলো। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব প্রস্তাব শুনে সাথে সাথেই বলে দিলেন,

-তুমি আমীরুল মুমিনীনকে বলে দিও এ-প্রস্তাবে আমি সম্মত নই।

-কেন?

-কারণ যুবরাজ ওলীদ কোন প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী নন।

-আপনি এতবড় একটা সুযোগ হেলায় হারাবেন? কী না হবে? ধন-সম্পদ, মান-সম্মান! পাশাপাশি আপনি খলীফাকেও প্রত্যাখ্যান করছেন না?

-শোন! আল্লাহর কাছে এ-বিশাল দুনিয়ার পুরোটা একটা মাছির ডানা-পরিমাণ গুরুত্বও রাখে না। এখন হিশেব মেলাও দেখি, খলীফার রাজত্ব এ-মাছির ডানার তুলনায় কতটা অকিঞ্চিৎকর?

-আমি আশংকা করছি, আপনার প্রত্যাখ্যানে খলীফা রেগে যাবেন!

-আল্লাহই মুমিনগণকে রক্ষা করেন।

.

যেন কিছুই হয়নি, এমন একটা ভঙ্গিতে সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব মসজিদে নববীতে চলে এলেন। পাঠদান করতে। বসতেই চোখ পড়লো কাসীর বিন আবি ওদাআহ-এর ওপর। ছাত্রটাকে খুবই ভাল লাগে। ভদ্র। বিনয়ী। ইলমপিপাসু। মুত্তাকী তো বটেই।

-আবু ওদাআহ! গত তিনদিন কোথায় ছিলে? দরসে আসোনি যে! তুমি তো দরসে কখনো 'নাগাহ' থাকো না!

-হযরত! আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। কাফন-দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

-আহা! আমাদেরকেও বলতে। তোমার পাশে দাঁড়াতাম। সান্ত্বনা দিতাম।

দু'আ করতাম! আর হ্যাঁ, নতুন কাউকে বিয়ে করেছ?

-হুযুর! আমার কাছে কে মেয়ে বিয়ে দেবে! টাকা-পয়সা নেই! পকেটে সাকুল্যে দুই কি তিন দিরহাম পড়ে আছে। এই সম্বল। আপাতত।

-তোমাকে কে মেয়ে দিবে মানে! আমি দেবো!

-সত্যি বলছেন হুযুর!

-তো আর কী বলছি!

.

বিয়ে হয়ে গেলো। আবু ওদাআহ পরে বলেছেন,

-আমি আনন্দের চোটে দিশেহারা বোধ করছিলাম। কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম। যে পাত্রীকে বিয়ে করার জন্যে খলীফা পর্যন্ত লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চালচুলোহীন আমি? চিন্তার ভাবে মাথা নুয়ে আসছিল। কার কাছ থেকে এখন ঋণ নেব? এমন একজন মানুষকে হাভাতে অবস্থায় ঘরে কিভাবে তুলি! কিছু একটা বিহিত করতেই হবে। মাগরিব পড়লাম। সেদিন আবার রোযা রেখেছিলাম। নামায শেষে ঘরে ফিরেই রাতের খাবার নিয়ে বসলাম। সামান্য রুটি আর তেলই সম্বল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো।

-কে?

-সায়ীদ!

আমি দ্রুত চিন্তা করলাম। মদীনায় যত সায়ীদ আছে, তাদের মধ্যে কে এখন আসতে পারে! আমার কাছে তো কারো আসার কথা নয়। ঘুর্ণাক্ষরে একবারও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াবের কথা মনে আসেনি। কারণ গত চল্লিশ বছর যাবত মসজিদ ও ঘর ছাড়া তাকে আর কোথাও কেউ দেখেছে বলে মনে করতে পারবে না। অত শত ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে দিলাম। এতবড় চমক অপেক্ষা করছে, স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। খোদ সায়ীদ বিন মুসাইয়াব দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে মনটা আশংকায় কেঁপে উঠলো, তিনি বোধ হয় সকালের ঝোঁকের বশে বিয়ে দিয়ে এখন ভুল বুঝতে পেরেছেন। মেয়ের তালাক নিতে এসেছেন,

-হুযুর! আপনি যে! কাউকে দিয়ে একটুখানি খবর পাঠালেই তো বান্দা দরবারে হাযির হয়ে যেতো!

Scanned with CamScanner

-তা হবে কেন! তোমার কাছেই তো আমাকে এখন আসতে হবে! তুমি বিপত্নীক মানুষ। ঘরে বউ নেই। তুমি একাকী রাত কাটাবে ব্যাপারটা খারাপ লাগলো। এই নাও তোমার 'জীবনসঙ্গিনী'। সাথে করেই নিয়ে এসেছি।

এতক্ষণে আমার চোখ পড়লো হযরতের পেছনে। বাবার মতোই উচ্চতা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা মেয়েকে হাত দিয়ে ধরে সামনে নিয়ে এলেন। ঠেলে দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। মানুষটা লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে। দরজা ধরে কোনও রকমে নিজেকে ঠেকালো। বাবা চলে গেলেন। সামনেই ছিলো আমার সেই 'রাজভোগ'। নতুন মানুষটা আমার খাবারের দৈন্যদশা দেখে ফেলার আগেই তড়িঘড়ি থালাটা সরিয়ে একদিকে রেখে দিলাম।

.

দ্রুত বাড়ির ছাদে উঠে হাঁক দিলাম,

-তোমরা কে কোথায় আছো, আমার বাড়িতে এসো!

সবাই দৌড়ে এলো। জানতে চাইলো,

-কী ব্যাপার! অসময়ে হাঁক ডাক করছো কেন?

-সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব আজ আমার কাছে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। একটু আগে হঠাৎ তিনি মেয়েকে রেখে গেলেন।

.

পাড়া-পড়শি মেয়েরা বউ দেখতে ভেঙে পড়লো। আমার আম্মু থাকতেন আরেক বাড়িতে। তিনিও খবর পেয়ে ছুটে এলেন। এসেই হুকুম জারি করলেন,

-এমন সোনার পুতলি মেয়েকে বউ হিশেবে পেয়েছিস! আগামী তিনদিন পর্যন্ত বউয়ের মুখ দেখাও তোর জন্যে হারাম। আমি আগে তাকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে নিই। তারপর তুই তার দেখা পাবি।

.

আম্মুর কথামতোই সবকিছু হলো। তিনদিন পর দেখা হলো আমাদের। এত সুন্দর মানুষ থাকতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এত ভাল কুরআনে হাফেয থাকতে পারে চিন্তাও করিনি কখনো। হাদীসশাস্ত্রে এত অগাধ পাণ্ডিত্য নারী তো দূরস্থান, কোনও পুরুষেরও থাকতে পারে বলে ধারণা ছিল না। তার

চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীর হক, স্বামীর আদব সম্পর্কে এত জ্ঞান আর সচেতনতাও কোনও নারীর মধ্যে থাকতে পারে, এমনটা ভাবিনি কখনো!

.

দেখতে দেখতে একটা মাস কোন ফাঁকে উড়ে গেলো। এ-কয়দিন আমিও মসজিদের দরসে হাযির হইনি, আমার শ্বশুরও এ-মুখো হননি। মাসকাবার হওয়ার পর, একদিন দরসে হাজির হলাম। সালাম দিলাম। সালাম নিলেন। আর কোনও কথা বললেন না। দরসদানে ব্যাপৃত হয়ে গেলেন। দরস শেষ হলো। সবাই যে যার পথে চলে গেলো। শুধু আমি আর তিনি বসা। প্রশ্ন করলেন,

-আমার মা-টা কেমন আছে?

-খুউব ভালো আছে।

.

আরও কিছু টুকটাক কথা বলে ঘরে ফিরে এলাম। আমার পিছুপিছু একজন মানুষ এসে একটা থলে দিলো।

-কে পাঠিয়েছেন?

-আপনার শ্বশুর।

খুলে দেখি বিশ হাজার দিরহাম!

জীবন জাগার গল্প: ৪৭০

দরজা খোলার ব্যবস্থা

কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করলো,

-আগামীকাল সকালে কামরা ছেড়ে বের হবে না। জান গেলেও না। কেউ এসে ডাকলেও দরজা খুলবো না। যেই আসুক।

স্বামীও তেতে উঠে বললো:

-আমিও না। দেখি কে হারে।

পরদিন সকালে। অনেক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও দুজনের কেউই বেরোচ্ছে না দেখে সবাই এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলো।

Scanned with CamScanner

ঘরভর্তি মেহমান। প্রথম সন্তানের আকীকা উপলক্ষে উভয় পক্ষের আত্মীয়রা এসেছেন।

প্রথম ধাপে ছোটরা দরজার কাছে এসে ডাকাডাকি করলো। দুজনের কেউই দরজা খুললো না।

পরের ধাপে এলো বড়রা। প্রথমে এলো স্বামীর বাবা-মা। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরও দরজা খুললো না। স্বামী উদাস হয়ে ছাদের কড়িকাঠ গোনায় ব্যস্ত থাকলো।

এরপর এলো স্ত্রী পক্ষের লোকজন। সবার শেষে এলো স্ত্রীর পিতা। বাবা আসতেই মেয়ে অস্থির হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে, বললো,

-আব্বুকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখতে মন সায় দিচ্ছে না। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

ঘটনার দশ বছর পরের কথা। এখন সংসারে একে একে চার ছেলে জন্ম নিয়েছে। আল্লাহ এবার ঘর আলো করে একটা মেয়ে সন্তান দিয়েছেন। বাবার খুশি আর দেখে কে। বড় ঘটা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। পাড়া প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন সবাই অবাক। কী ব্যাপার! এর আগে চার সন্তান হলো, কারো জন্যই তো এমনটা হয়নি। সবাই কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো,

-মেয়ে হওয়ার পর এমন ঘটা আয়োজন যে?

-বেশি কিছু নয়, ভবিষ্যতে দরজা খোলার সামান্য ব্যবস্থা করে রাখলাম।

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৭১

ফেক নাম্বার!

রাতে বাড়ি ফিরেই বেলকনিতে দাঁড়িয়ে, লুকিয়ে কার সাথে যেন কথা বলে। ব্যাপার গত কয়েকদিন যাবৎ চোখে পড়ছে। প্রথম প্রথম কিছু না বললেও, স্ত্রীর মনে শঙ্কা জাগলো। অন্য কিছু নয় তো!

স্বামী লক্ষ্য করলো স্ত্রীর ভাবান্তর। মনে মনে মুচকি হাসলো। মুখে কিছু বললো না। মোবাইলটাকে লুকিয়ে রাখতে শুরু করলো। স্ত্রীর মনে আর

Scanned with CamScanner

কোনও সন্দেহ রইল না: তার স্বামী অন্য কারো সাথে কথা বলছে। সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় কিছুই হবে, নইলে এভাবে মোবাইল আগলে রাখবে কেন? সব সময়?

•

মনে মনে ঠিক করলো আজ রাতে না ঘুমিয়ে জেগে থাকবে। রাত গভীর হলে, চুপিচুপি মোবাইলটা নিয়ে, ডায়াল নাম্বারগুলো দেখবে। তাই হলো। প্রথমেই এক মহিলার নাম খাদীজা! অনেক চিন্তা করেও এ-নামে স্বামীর দিকের কোনও আত্মীয়কে মনে করতে পারলো না। দু'চোখের ঘুম উধাও হয়ে গেলো। কে এই খাদীজা! তার সাথে এত কথা কিসের? প্রতিদিন? কী সম্পর্ক তার সাথে? কিভাবে সম্পর্কটা হলো? ক'দিন ধরে চলছে? আরো নানা চিন্তার ভারে মাথায় জট পাকিয়ে গেলো। কাটলো নির্ঘুম রাত! সকাল হলো। স্বামী কাজে চলে গেলো।

উদ্বেগ জর্জর একটা দিন কাটালো স্ত্রী। মনে একটুও স্বস্তি নেই। মনে ভেতর একটা চোরাকাঁটা বিঁধে আছে যেন। নানা এলোমেলো দুশ্চিন্তা মাথার ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘরকন্নার কাজেও মনে বসলো না। রাতেও ঠিক আগের মতো স্বামী খেয়েদেয়ে যথারীতি বেলকনিতে! আজ মরিয়া হয়ে, একেবারে হাতেনাতে ধরলো,

-প্রতিদিন তুমি এ-সময় কার সাথে কথা বলো?

আচানক স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বামী হকচকিয়ে গেলো। থতমত খেয়ে, আমতা আমতা করে বললো:

-কই, এই তো একজনের সাথে!

-সে একজনটা কে শুনি!

-হবে একজন!

-আমি জানি সে কে, তার নাম খাদীজা!

স্বামী চমকে উঠলো। চেহারায় ধরা পড়ে যাওয়া ভীতির ছাপ ফুটে উঠলো। স্ত্রী আবার বললো,

-খাদীজা কে?

স্বামী এবার কিছুটা স্বাভাবিক স্বরেই বললো,

-ঠিক আছে, তুমিই জেনে নাও কে সে?

Scanned with CamScanner

স্ত্রী মোবাইলটা হাতে নিয়ে সে নাম্বারে ডায়াল করলো, একই সময়ে তার নিজের মোবাইলেও রিঙ বেজে উঠলো। আম্মু ফোন করেছেন বোধ হয়। হাতে নেয়ার পর দেখা গেলো স্বামীর নাম্বার থেকে কল আসছে! অবাক কাণ্ড! আম্মু নয়। কল এসেছে 'ওর' নাম্বার থেকে? ব্যাপার কী? আমি তো জনৈকা খাদীজার নাম্বারে ফোন করলাম!

স্বামীও পিছু পিছু এসেছিল, তার দিকে ফিরে জানতে চাইলো,

-তুমি আমার নাম্বার খাদীজা নামে কেন সেভ করেছো?

-কারণ একটা তো অবশ্যই আছে!

-কী সেই মহার্ঘ্য কারণ, বলো শুনি!

-তুমি তো খাদীজারই মতো!

-পুরানো কেউ বুঝি!

-হ্যাঁ!

-কই এতদিন তো তার কথা শুনিনি! হঠাৎ পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো!

-খাদীজার কথা আমার সবসময়ই মনে থাকে।

-ঘর করছো একজনের সাথে, কল্পনায় স্থান দিয়েছো আরেকজনকে!

-সত্যি বলোছো। তোমার মধ্যে আমি এমন কিছু গুণ পেয়েছি, যা খাদীজা (রা.)-এর মধ্যেও ছিল।

তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ নবীজির হাতে সঁপে দিয়েছিলেন: তুমিও বিয়ের পর তাই করেছো!

তিনি শত বিপদেও ধৈর্য্য না হারিয়ে, স্বামীকে আগলে রাখতেন। সান্ত্বনা দিতেন। সাহস যোগাতেন। পরামর্শ দিতেন। কল্যাণ কামনা করতেন। তুমিও আমার জন্যে কী না ত্যাগ করেছো! আমি তো তোমাকে বিয়ে করার যুগ্যিই ছিলাম না। তুমি সবকিছু মেনে নিয়েছো। হাসিমুখে। আমার পেছনে তুমি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছ। তোমার হাত ধরে আমি এতটা পথ হেঁটে আসার সাহস পেয়েছি। প্রেরণা পেয়েছি! বলো, তুমি আমার খাদীজা নও!

-ও আল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! ওগো আমি তোমায় ভুল বুঝেছি! আমায় ক্ষমা করো!

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৭২

পানিসিঞ্চন

প্রথম দিন

-আজ বাসায় একটা ঘটনা ঘটেছে। তুমি তো তখন অফিসে!

-আচ্ছা, সকালে শুনবো। এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তুমি খেয়ে নাও। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে।

-আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ঘুমাও। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরেছ!

.

দ্বিতীয় দিন

-বিকেলের দিকে হঠাৎ বড় আপু এসে হাজির! বলা নেই, কওয়া নেই! বাসায় উপস্থিত কিছুই ছিল না। কী যে সমস্যায় পড়েছিলাম। দুলাভাই না থাকলে সমস্যা ছিল না। পাশের ফ্ল্যাটে একটা দাওয়াতে এসেছিলেন। সুযোগ পেয়ে এখানেও একটু ঢুঁ মেরে গেলেন।

-ও তাই নাকি! আচ্ছা বাকিটা পরে শুনি? সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে গেছি!

.

তৃতীয় দিন

-এত বার কল দিলাম। রিসিভও করলে না, ব্যাকও করলে না! বড্ড ব্যস্ত ছিলে বুঝি!

-উঁ!

-বিদ্যুৎ বিল নিয়ে এসেছিল দারোয়ান! গতমাসের টাকা নাকি জমা হয়নি! বাড়িওয়ালা তাই বলতে পাঠিয়েছেন!

-উঁ!

-বাথরুমের দেয়াল চুঁইয়ে নাকি নিচতলায় পানি পড়ে। সেটা ঠিক করতে বলে দিলো। এই তুমি শুনছো না! ঘুমিয়ে পড়েছো?

-উঁ!

.

Scanned with CamScanner

চতুর্থ দিন

-শুনছো!

-উঁ

-আগামী কাল আব্বু আসবেন বলেছেন। আমি কি তার সাথে যাবো?

-উঁ!

-পরিষ্কার করে বলো না!

-হুঁ!

-আমি না থাকলে তোমার কষ্ট লাগবে না?

-উঁ!

-তুমিও অফিসের পর আমাদের বাসায় চলে আসলেই পারো!

-উঁ!

.

স্বামী পরদিন ঘরে ফিরে দেখলো সব খালি। খাঁ খাঁ। অবাক হলো, কোথায় গেলো ঘরের মানুষটা? খাবারকক্ষে গিয়ে চোখ পড়লো ফ্রিজের দরজায় সাদা কাগজের ওপর।

-আমি গেলাম। খাবার রান্না করা আছে। খেয়ে নিও!

তখন মনে পড়লো গতরাতের কথা! রাত কাটলো। দিন কেটে গেল। আবার রাত এলো কিন্তু স্ত্রীর দেখা নেই। ফোনও করল না। ফোন করলেও ধরে না। এবার টনক নড়ল! কী ব্যাপার! এমন তো হওয়ার কথা নয়!

পরদিন অফিস থেকে সোজা শ্বশুর বাড়ি গেল। স্ত্রী থমথমে মুখে সামনে এলো।

-কী ব্যাপার! ফোন করলেও না, ধরলেও না!

-ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম!

-এখানে তোমার ক্লান্তি কিসের?

-উঁ!

.

স্বামী যাই প্রশ্ন করে, স্ত্রী শুধু উঁ শব্দেই উত্তর দিতে শুরু করলো। বেশ কিছুক্ষণ পর ব্যাপার মাথায় ঢুকলো।

Scanned with CamScanner

-ও হো! বুঝতে পেরেছি। তোমার প্রতি মনোযোগ দিতে পারিনি। আর ক্লান্তও ছিলাম।

-তাই বলে প্রতিদিন!

-আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে।

-একটা কথাই শুধু আমার মনে হয়েছে, এ-ক'দিন।

-কোন কথা?

-তুমি যদি ফুলের যত্নই নিতে না পারো, তবে কেন ফুল ছেঁড়ো? ফুল ছিঁড়লে, গন্ধ না শুঁকে ফেলে রাখলে সেটা শুকিয়ে যায় না! একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে ফুলের মতো। ফুলটা তোমাকে সুখী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে আর তুমি অবহেলা করছো সে ফুলকে?

-ক্ষমা করো, আমি এবার থেকে ফুলটাকে শুকোতে দিবো না! সবসময় সজীব রাখতে সচেষ্ট থাকবো!

জীবন জাগার গল্প: ৪৭৩

বৌ নয় মৌ!

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

-আমি মক্কার বাজারে গেলাম। কাপড় কিনতে। দোকানদার শুরু থেকেই কাপড়ের প্রশংসা করতে শুরু করলো। ক্ষণে ক্ষণে শপথ করে বলতে লাগলো, তার কাপড়ই বাজারের সেরা, ইত্যাদি।

.

কাপড় না কিনেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। এমন লোকের কাছ থেকে কিছু কেনা নিরাপদ নয়।

.

দুই বছর পর আবার হজ্জে গেলাম। আবার কাপড় কিনতে গেলাম। অদূরে দাঁড়িয়ে লোকটার প্রতি লক্ষ রাখলাম। নাহ, আগের মতো প্রশংসা-শপথ কোনওটাই করছে না। ক্রেতাও নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করছে।

.

এগিয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম,

Scanned with CamScanner

-তুমি কি অমুক লোক নও?

-জি।

-তাহলে তোমার এই পরিবর্তনের কারণ কী?

-তখন আমার ঘরে প্রথম স্ত্রী ছিল। আমি যদি সন্ধ্যায় অল্প টাকা নিয়ে ফিরতাম সে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে রাতটা মাটি করে দিত। যত বেশি টাকাই নিয়ে যেতাম, তার চোখে লাগত না। আরও বেশি কেন রুজি করলাম না, তা নিয়ে উঠতে-বসতে খোঁটা শুনতে হতো। তার বাপের দোহাই দিত!

-তারপর?

-আল্লাহ আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। প্রথম স্ত্রী মারা গেছে। দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। বিয়ের পরদিন বাজারে আসছি, বউ পেছন থেকে আমার জামা টেনে গতি রোধ করে বললো,

-শুনুন! আল্লাহকে ভয় করে চলবেন। আমাদেরকে হালাল খাওয়াবেন। গুনাহ করে বেশি কামানোর প্রয়োজন নেই।

আপনি হালাল পথে কম রোজগার নিয়ে এলেও সেটাকে আমি পরম সমাদরে অনেক বেশি মনে করবো।

আপনি যদি কিছু না নিয়েই রাতে ফিরলে, সেটাই আল্লাহর ফয়সালা বলে খালি পেটে ঘুমিয়ে পড়বো।

= তবুও হারামের পথে যাবেন না।

জীবন জাগার গল্প: ৪৭৪

স্বামী-স্ত্রী!

এক সাহাবী স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন। আমীরুল মুমিনীন উমর (রা.)-এর কাছে। স্ত্রী বড্ড বেশি জোরে কথা বলে। স্বামীর সাথে রাগারাগি করে।

.

দরজায় টোকা দিতে যাবেন, এমন সময় কানে উমরের স্ত্রীর কড়া কণ্ঠ ভেসে এল। উমরকে বকাবকি করছেন।

সাহাবী হতাশ হয়ে পড়লেন। কার কাছে বিচার নিয়ে এলাম! সে নিজেই তো ভুক্তভোগী। আমার সমাধান কী করবে?

•

সাহাবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে যাবেন কিনা ভাবছেন। উমর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

-তুমি কোনও প্রয়োজনে এসেছ বোধহয়?

-জি। আমার স্ত্রীর গলার আওয়াজ নিয়ে অভিযোগ ছিল। কিন্তু আপনিও দেখি........।

-হ্যাঁ। তবে আমি সহ্য করে নিই। সে কষ্ট করে আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করে। আমার জামা-কাপড় ধুয়ে রাখে । বিছানা বিছিয়ে দেয়। আমার সন্তানদের লালন পালন করে। ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। সে নিজ থেকেই এসব করে। শরীয়ত কিন্তু তাকে এসব করতে বলেনি।

সে আমার জন্যে এতকিছু করে, আমি তার সামান্য আওয়াজ সহ্য করতে পারবো না!

(অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন, ঘটনাটা ভুলক্রমে উমার রা.-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাস্তবে ঘটনাটা অন্য কারো)!

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৭৫

মনের মতো বউ!

-হুযুর! আমি চাই আমার হবু স্ত্রী মহৎপ্রাণা হোক!
-বেশি বেশি দান-সাদাকা করো।
-আমি চাই আমার স্ত্রী মমতাময়ী হোক!
-অন্যদেরকে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা করো।
-আমি চাই আমার স্ত্রী আদর্শ চরিত্রময়ী হোক!
-তাহলে বাপু, আগে তোমার চরিত্রকে ঠিক করো।
-আমি চাই আমার স্ত্রী আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত থাকুক!
-তাহলে বেগানা নারীর দিকে তাকানো বন্ধ করো। দৃষ্টি অবনত করো।
-আমি চাই আমার স্ত্রী সংসার অন্তপ্রাণ হোক!
-তাহলে তুমি আগে সংসারে বেশি করে সময় দাও।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প: ৪৭৬

আমলী যিন্দেগী!

মা-বোনেদের কিছু কাজ নিয়মিত করতেই হয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক। একটু মনোযোগ দিলেই সেগুলোকে ইবাদতে রূপান্তরিক করা সম্ভব। এমনিতেই পারিবারিক কাজ, ঘরোয়া টুকিটাকি কাজ ইবাদতের অংশ। সাথে সাথে নিয়্যতের মধ্যে বাড়তি চিন্তা যোগ করলে সওয়াবের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে হয়। নতুন আরো কিছু হাদীস মানার সওয়াব মিলবে।

এক.

প্রতিদিনই ঘর ঝাড়ু দিতে। মেশিন দিয়ে ধূলো ঝাড়তে হয়। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হয়। উঠোন নিকোতে হয়। সদর-অন্দর ঝকঝকে-তকতকে রাখতে হয়। আমরা কাজটাকে বেগার খাটা বা সংসারের কাজ মনে না করে, ইবাদত মনে করেও করতে পারি। স্মরণ করতে পারি,

= ইমাতাতুল আযা মিনাত্তরীক। পথ থেকে কষ্টকর বস্তু সরিয়ে দেয়া ঈমানের অঙ্গ।

কাজও হলো। ইবাদতও হলো। বান্দাও রাজি মাওলা ভি রাজি।

দুই.

প্রতিদিনই রান্না করতে হয়। কুটনা কুটতে হয়। বাটনা বাটতে হয়। জিরা পিষতে হয়। পেঁয়াজ কুঁচোতে হয়। উনুন জ্বালতে হয়। তেল আঁচাতে হয়। ধোঁয়ার নাকের পানি চোখের পানি এক করতে হয়। রান্না হয়ে গেলে বেড়ে দিতে হয়। জনে জনের রুচি-খাঁইয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

এটাকে নিছক ঘরকন্নাগিরি (কেউ কেউ ঝি গিরি) মনে না করে, ইবাদতের নিয়ত করতে পারি,

-ইতআমুত ত্বা'আম। খাবার দান। আহার করানো।

বহুত বড়িয়া ইবাদত। অনেক ফযীলতের কাজ। শানদার খিদমত। জানদার আমল। প্রাণদার আজর।

তিন.

বাচ্চাকে পড়া দেখিয়ে দিতে হয়। কুরআন শেখাতে হয়। দ্বীন শেখাতে হয়। একটা কথা মনে রাখলেই সব কষ্ট পানি হয়ে যাবে।

Scanned with CamScanner

-তোমাদের মধ্যে কুরআন শিক্ষাদাতা সর্বোত্তম।

চার.

ঘরে মেহমান আসে। আদর-আপ্যায়ন করতে হয়। যত্ন-সমাদর করতে হয়। অনেক পরিশ্রম হয়। কেউ বিরক্ত হয়, কেউ আনন্দিত হয়। একটা হাদীস মনে রাখলে মনের ভার অনেকটা কমে আসে।

= যে আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।

পাঁচ.

শ্বশুর বাড়িতে নানা রকমের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কটু-কাটব্য শুনতে হয়। খোঁচা-শ্লেষ সহ্য করতে হয়। ননদ থেকে। জাদের থেকে। ভাসুর থেকে। দেবর থেকে।

একট হাদীস মনে করে দাঁতমুখ চেপে সহ্য করে নিলেই বিরাট ইবাদত।

= যে ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ছয়.

ঘরে অসুস্থ বাবা-মা। শ্বশুর-শাশুড়ি। দাদা বা নানা, দাদা শ্বশুর-শাশুড়ি। তাদের সেবাযত্ন করতে হয়। অনেক সময় একপ্রকার বাধ্য হয়েই। গজগজ করতে করতে। একটা হাদীস মনে মনে আউড়ে নিলেই পারি,

= অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও।

সাত.

বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে যেতে হয়। পারিবারিক উৎসব-আয়োজনে হাযির থাকতে হয়। লওয়াযেমা হিশেবে, মুখ রক্ষার্থে হলেও কিছু উপহার-উপাচার দিতে হয়। নিয়ে যেতে হয়। একটা হাদীস মনে রাখলে মনের কষ্ট আর থাকবে না।

-তোমরা হাদিয়া দাও, তাহলে পরস্পরের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

আট.

ঘরের ফোন ওঠাতে হয়। কথা বলতে হয়। পরিচিত কেউ হলে অনেক সময় গীবত হয়ে যায়। কখনো কখনো অন্যের কষ্টের কথা শুনতে হয়। তখন মনে রাখা,

Scanned with CamScanner

ক: গীবত করা বড় গুনাহ।

খ: অন্যের কষ্টের কথা শোনা, তাকে সান্ত্বনা দেয়াও ইবাদত।

নয়.

ঘরের কাজ কম নয়। এঁটো থালা-বাসন মাজা, জামা-কাপড় ধোয়া, ভিজে কাপড় মেলে দেয়া। এসব কাজে মাথা লাগাতে হয় না। অনেকটা অভ্যেসবশেই করা হয়ে যায়। এ-সময়টুকুতে আমরা ইস্তেগফার করতে পারি। দুরূদ শরীফ পড়তে পারি। একসাথে অনেক ইবাদত হয়ে গেলো।

দশ.

সারাদিনই কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রতিটি কাজই আমরা ইবাদতের নিয়তে করতে পারি। তাহলেই আটপৌরে সাংসারিক কাজও পুরোদস্তুর ইবাদতে পরিণত হবে। এমনকি বাঙালি বধূদের শরৎকাহিনী খুলে দ্বি-প্রাহরিক ভাতঘুমও এর আওতাভুক্ত।

জীবন জাগার গল্প: ৪৭৭

পুরুষদের স্বভাব

পুরুষরা পাঁচটা কথা খুব মনে রাখে। সুযোগ পেলেই সেগুলো আওড়াতে দেরি করে না।

এক. পুরুষদের রয়েছে নারীদের ওপর কর্তৃত্ব (কুরআন কারীম)।

দুই. তোমরা বিয়ে করো দুই-দুই, তিনতিন, চারচার মহিলাকে (কুরআন কারীম)।

তিন. নিশ্চয়ই তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত ভয়াবহ (কুরআন কারীম)।

চার. পুরুষদের জন্যে রয়েছে নারীদের দ্বিগুণ (কুরআন কারীম)।

পাঁচ. নারীরা আকল ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ (আল হাদীস)।

***

পুরুষরা পাঁচটা কথা বেমালুম ভুলে যায়।

এক. তোমাদের সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম (আল হাদীস)।

দুই. তোমরা কাঁচকে কোমলভাবে ধরো। অর্থাৎ নারীদের সাথে কোমল আচরণ করো। (আল হাদীস)।

Scanned with CamScanner

তিন: তোমরা নারীদের জন্যে কল্যাণ কামনা করো (আল হাদীস)।

চার: (তোমরা একাধিক বিয়ে করলে) যতই চাও, কিছুতেই সমতা বজায় রাখতে পারবে না (কুরআন কারীম)।

পাঁচ: নারীদেরকে একমাত্র মহৎ ব্যক্তিরাই সম্মান দান করে। একমাত্র নীচ ব্যক্তিরাই তাদেরকে অসম্মান করে (আল হাদীস)।

জীবন জাগার গল্প: ৪৭৮

অলক্ষুণে স্বামী (!)

একটি কনসালটেন্সি ফার্ম। বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। কেউ সরাসরি এসে মুখোমুখি হয়। আবার কেউ দেখা দিতে চায় না। অগোচরে থেকে কাজ সারতে চায়। অবশ্য আগে থেকেই সময় নিয়ে রাখতে হয়। গাঁটের পয়সা খরচ করে।

.

একটা ফোন এল।

-আমি খাওলা। আমি খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছি। জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

-একটু খুলে বলবেন?

-বলছি। আমার স্বামী খুবই অশুভ একজন মানুষ।

-কিভাবে বুঝলেন?

-আমার বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই আম্মা ইন্তেকাল করেন। আমি বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম। আমার আর কেউ রইল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার স্বামীর কারণেই আম্মা মারা গেছেন। তার সাথে আমার বিয়ে না হলে, দুঃখিনী মা আমার মারা যেতেন না। এখন আমি কী করতে পারি?

-আপনি পুরো বিষয়টাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছেন না কেন? আপনি এটাকে আল্লাহর দয়া হিসেবেও তো নিতে পারেন!

-আমি জানি এবং মানি, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু বিয়ের পরই তো দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটলো?

-আমি বলবো, এ-সময় আপনার মায়ের মৃত্যুটাই প্রমাণ করে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। তবে আপনার মনে আগে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে। আসুন

Scanned with CamScanner

হিসেব মিলিয়ে দেখি, = আপনার আম্মা যদি বিয়ের এক বছর আগে মারা যেতেন,আপনার জীবনটা সুস্থির থাকতো না। স্থিতিশীল থাকতো না। আপনি মায়ের মৃত্যুতে খুবই ভেঙ্গে পড়তেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিশেষভাবে দয়া করে, মায়ের মৃত্যু ঘটিয়েছেন, বিয়ের এক সপ্তাহ পর। যাতে আপনার বিয়েটা সূচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে যায়।

.

= আল্লাহর এটা অনেক বড় দয়া, আপনার পাশে স্বামী আসার পর মা মারা গেছেন। না হলে, আপনি একাকী হয়ে পড়তেন।

.

= আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, আপনার মা যদি বিয়ের একটা সপ্তাহ আগেও মারা যেতেন, তাহলে আপনার বিয়েটাই হতো না। আপনি ভাঙ্গা মন নিয়ে কিভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতেন? একজন সম্পূর্ণ এতিম মেয়েকে কেইবা বিয়ে করতে চায়? মহৎ ব্যক্তি ছাড়া?

.

= আপনার আম্মা যদি বিয়ের এক বছর পরও মারা যেতেন, সেটাও হতো খুবই কষ্টের। কারণ আপনি চলে আসতেন স্বামীর বাড়ি। মা তখন নিজের বাড়িতে একাকী-নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন।

.= আপনি কি কুরআন কারীমের আয়াতটা পড়েননি, আর এমনও সম্ভব যে, তোমরা কোনও বিষয়কে অপছন্দ কর অথচ সেটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর এমনও সম্ভব যে, তোমরা কোনও বিষয়কে পছন্দ করো অথচ সেটা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর (সূরা বাকারাঃ ২১৬)।

.

= যা হয়েছে, সেটা আসলে আপনাদের উভয়ের জন্যেই ভাল হয়েছে।

= আপনি এটা মনে করবেন না, আপনার বিয়েটা অশুভ।

= আপনি এ-ভেবে কৃতজ্ঞ থাকুন আপনার আম্মা কোনও কষ্ট-যাতনা ভোগ করা ছাড়াই মারা গেছেন।

= এটা ভেবে কৃতজ্ঞ থাকুন, আপনার আম্মা মারা গেছেন, আপনি তখন স্বামীর নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। স্বামী ছাড়া আপনি তখন খুবই একাকী আর অসহায় হয়ে পড়তেন।

Scanned with CamScanner

= জীবনে সুখ নির্ভর করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। আপনি চাইলে চরম বিপদের মাঝেও আল্লাহর দয়া দেখতে পাবেন। তার অনুগ্রহ খুঁজে পাবেন।

= সুখ-দুঃখ আপনার হাতে। আপনার দেখার কারণেই একটা বিষয় সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, অসুন্দরও হয়ে উঠতে পারে। আপনি আল্লাহর রহমতের বদলে দেখতে পাবেন গযব।

= আপনার স্বামী আপনর জন্যে গযব নয়, রহমতস্বরূপ। তার মূল্যায়ন করুন। দেখবেন সুখী হয়ে গেছেন।

জীবন জাগার গল্প: ৪৭৯

ভালোবাসার শক্তি!

দিন-রাত অসুস্থ-পঙ্গু স্ত্রীকে কোলে-কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে, এমন স্বামীর কথা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। কিন্তু মানুষের মহত্ত্বের তো কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। ভালোবাসা সীমাহীন একটা ক্ষমতা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছে।

সলীম রাখরূখ। বয়েস চল্লিশ ছুঁইছুঁই। আলজেরিয়ার ইলমা শহরে এক স্কুলে পাহাদারের চাকুরি করে। বিয়ে করেছে ১৯৯৬ সালে। বউ নিয়ে স্কুলের দেয়া একটা ছোট্ট বাসাতেই সুখে-শান্তিতে জীবনটা কেটে যাচ্ছিল।

.

বিয়ের এক বছর পর, তখনো ছেলে মুহাম্মাদের জন্ম হয়নি। শাশুড়ি মারা গেলেন। স্ত্রী মায়ের শোক সহ্য করতে পারল না। মানসিকভাবে ভীষণ আঘাত পেলো। মায়ের মৃত্যুর বিশদিনের মাথায় তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেলো। আরও কয়েক দিন পর, হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও লোপ পেল। একেবারে পুরোপুরি প্যারালাইজড।

.

সলীম এতে দমে না গিয়ে, নিজের জীবনটা স্ত্রীর জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। একটুও চিন্তা না করে, দ্বিধা না করে, কিভাবে স্ত্রীকে আরামে রাখা যায় তার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

Scanned with CamScanner

তার প্রতিদিনকার নিত্য রুটিন,

এক. প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই, স্ত্রী-পুত্রের জন্যে নাস্তা তৈরী করে রেখে কাজে চলে যান।

দুই. একঘণ্টা পর বাসায় ফিরে আসেন। ছেলেকে পাশে নিয়ে নাস্তা খেতে বসেন। স্ত্রীকে নিজ হাতে লোকমা ধরে খাইয়ে দেন। কোনদিন ছেলেও মা-কে খাইয়ে দেয়। প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ-পথ্য খাইয়ে দেন।

তিন. এরপর বাসা পরিষ্কার করতে লেগে পড়েন। হাতের কাজ শেষ করে, স্ত্রীর পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে জানলার কাছটাতে নিয়ে বসিয়ে দেন। কাজ করার পাশাপাশি স্ত্রীকে পত্রিকা পড়ে শোনান। বিভিন্ন গল্প করেন।

চার. আবার কাজে চলে যান। একটানা বিকেল পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হয়। ফাঁকে ফাঁকে এসে এক দৌড়ে স্ত্রীকে দেখে যান। ছেলেকে স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনেন। দুপুরে খাওয়ান। ঘুম পাড়িয়ে আবার কাজে চলে যান।

পাঁচ. রাতের বেলা কমপক্ষে তিনবার ঘুম থেকে জাগেন। স্ত্রীকে পাশ ফিরিয়ে শোয়ান।

.

এটা তো গেল আলজেরিয়ার কথা। আমাদের বাংলাদেশেও এমন স্বামীর দৃষ্টান্ত নেই তা নয়। ঢাকার মুহাম্মাদপুরেই একজন পরিচিত মহান মানুষ আছেন। তিনি আজ অনেক বছর ধরে অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করে আসছেন। পরম আদরে। অতি যত্নে।

.

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এ-মহান মানুষটাও কর্মজীবনে শুরুতে কিছুদিনের জন্যে আলজেরিয়াতে ছিলেন। আমার মনে কৌতূহল জেগেছে, আলজেরিয়াতে কি স্বামীরা স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল?

জীবন জাগার গল্প: ৪৮০

বিচক্ষণ পুত্রবধু

বিয়ের একমাস পরের কথা। শাশুড়ী আক্ষেপ করে বললেন,

-বৌমা! লাবীবকে দেখছি নিয়মিত নামায পড়ছে?

-জি, আম্মা। এই একমাসে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, অনেক মান-অভিমান করে নামায ধরিয়েছি।

শাশুড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

-তুমি এক মাসের চেষ্টাতেই তাকে নামাজ ধরিয়ে ফেলেছ। অথচ আমি ত্রিশ বছর ধরে অনবরত চেষ্টা করেও সফল হতে পারলাম না।

-আম্মা! ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে 'ওর' নামায ধরার পেছনে আপনার অবদানই বেশি।

-কিভাবে?

-ওই গল্পটা তো আপনি জানেন। ঐ যে,

-এক গাঁয়ের রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড একটা পাথর ছিলো। অনেক চেষ্টা-তদবীর করেও পাথরটা কেউ সরাতে পারলো না। মানুষের পথ চলাচলে খুবই সমস্যা হতে লাগলো। পাথরটা আগে ছিলো না। সেবার ভূমিকম্পের প্রবল কাঁপুনিতে পাশের পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচে নেমে এসেছে।

প্রথম প্রথম প্রায় সবাই চেষ্টা করেছিলো। না পেরে সবাই ক্ষান্ত হয়েছে। গ্রামের একজন লোক ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলো না। লোকটা গাঁইতি আর বিরাট এক হাতুড়ি নিয়ে পাথরটা ভাঙার কাজে নেমে পড়লো। অনেকের কাছেই সাহায্য চাইলো। কেউ এগিয়ে এল না। লোকটা একা একাই কাজ চালিয়ে গেলো। পাথরের মাঝ বরাবর একটা দাগ টেনে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতে শুরু করলো। বেশ কয়েকদিন কাজ করে গেলো। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি সাধিত হলো না। পঞ্চমদিন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলো। রাস্তা দিয়ে আরেক লোক যাচ্ছিলো। তাকে বললো,

-ভাই! আপনাকে দেখে বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে। আপনি কি এই হাতুড়ি দিয়ে পাথরটাতে কয়েক ঘা লাগাতে পারবেন?

-জি পারবো।

Scanned with CamScanner

লোকটা এগিয়ে এসে তার মাংসল দুই বাহু দিয়ে ভীষণ জোরে এক আঘাত করলো। এক আঘাতেই প্রকাণ্ড পাথরটা ফেটে দু'খানা হয়ে গেলো। সবাই অবাক হয়ে দেখলো পাথরের ভেতরে একটা স্বর্ণের মোহরভর্তি থলে পড়ে আছে। দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল থলেটার মালিকানা নিয়ে। প্রথম জন বললো,

-আমি আজ পাঁচদিন ধরে পাথরটা ভাঙার চেষ্টায় আছি। সুতরাং থলেটাতে আমারও ভাগ আছে।

-আরে মিয়া! রাখেন আপনার পাঁচ দিন। এই পাঁচদিনে আপনি কী করতে পেরেছেন? কিছুই পারেননি। আমার এক ঘায়েই পাথরটা ঘায়েল হয়েছে। সুতরাং থলে পুরোটাই আমারই প্রাপ্য।

কোনও সমাধানে আসতে না পেরে, দুজনে কাজীর কাছে গেল বিচারের জন্য। সব শুনে কাজী বললেন, 'প্রথম জন এতদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে। তার প্রাপ্য ৯৯ ভাগ। আর যে শেষ আঘাতটা করেছে সে পাবে ১ ভাগ।'

-আম্মু! 'ওর' নামাযের পেছনে আপনার অবদানই সিংহভাগ। আপনার এতদিনের প্রচেষ্টাতেই ও ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হয়ে ছিলো। আমি শুধু হাতুড়ির শেষ আঘাতটা করেছি।

জীবন জাগার গল্প : ৪৮১

ভালোর জন্য ভালো

বিয়ের পরপরই স্বামী বিদেশে গেল। রাদিয়া বাবার বাড়িতেই থাকে। শ্বশুর বাড়িতে এক দেবর ছাড়া আর কেউ নেই। বিয়ের তিন মাসের মাথায় রাদিয়ার মোবাইলে একটা ফোন এলো। অপরপ্রান্তে এক মহিলা নিজের পরিচয় না দিয়েই, তার স্বামী সম্পর্কে অনেক কথা বললো। রাদিয়া অজ্ঞাত মহিলার কথা শুনে হাঁ-না কোনও মন্তব্য করলো না।

এভাবে পরপর কয়েকদিন মহিলাটা ফোন করলো। রাদিয়াও চুপচাপ শুনে গেলো। পাল্টা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালো না। বাড়ির কাউকেও এ ব্যাপারে জানাল না। প্রতিদিন বিকেলে স্বামীর সাথে কথা হয়, তাকেও কিছু জানতে দিলো না। তবে রাদিয়া বুদ্ধি করে একটা কাজ করলো, অজ্ঞাত মহিলা যখন দ্বিতীয় দিন ফোন করলো, তখন থেকেই সে পুরো বক্তব্যটা রেকর্ড করে রাখল।

Scanned with CamScanner

এভাবে দিন কেটে যেতে লাগলো। মহিলাটাও ক্লান্তিহীনভাবে তার চেষ্টা চালিয়ে গেলো। এমনকি কয়েকটা চিঠিও তার কাছে আছে বলে দাবী করলো। রাদিয়া কোনও প্রত্যুত্তর করলো না।

এর এক বছর পর, রাদিয়ার স্বামী দেশে এলো। আসার সময় স্ত্রীর জন্য ভালো একটা মোবাইল সেট নিয়ে এলো। নতুন মোবাইলে আগের মেমোরি কার্ডটা ইনপুট করতে গিয়ে দেখলো কার্ডে অনেকগুলো ভয়েস রেকর্ড। কৌতূহলী হয়ে সেগুলো শুনে তার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেলো। সাথে সাথেই স্ত্রীকে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইল। রাদিয়া বললো,

-এই মেয়েটা অনেক দিন ধরে এসব কথা আমাকে বলে আসছিলো। আমি তাকে কোনও উত্তর দেইনি।

- সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা এতকিছু হয়ে গেলো, এতদিন আমাকে কিছু বলোনি যে?

-কী বলবো? আমি তো মহিলাটার কথা একটুও বিশ্বাস করিনি।

-বলছো কি তুমি? এই মেয়েটা তো আমার সম্পর্কে এমন কোনও খারাপ অপবাদ নেই, যা সে বাকী রেখেছে?

-সে যাই বলুক, আমি শুধু একটা কথা সবসময় মনে রেখেছি।

-কোন কথা?

-আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেছেন, (ভালো নারীরা ভালো পুরুষদের জন্য এবং ভালো পুরুষরা ভালো নারীদের জন্য: নূর:২৬)।

আমি ছেলেবেলা থেকেই, আমার জানামতে বড় কোনও গুনাহ করিনি। আমাদের বাড়ির পরিবেশের কারণে একটু বড় হওয়ার পর থেকেই পূর্ণ পর্দার মধ্যেই জীবনটা কেটেছে। বিয়ের আগে অন্য কোনও পুরুষের সাথেও আমার কখনো কথা হয়নি। আম্মু এ বিষয়টা খুবই গুরুত্বের সাথে লক্ষ রাখতেন।

আমার বিশ্বাস ছিলো, আমি ভালো হলে আপনিও ভালো হবেন। কে কী বললো তাতে কান দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআন সত্য। তাই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আমার স্বামীও একজন ভালো মানুষ।

-রাদিয়া! তোমার মতো জীবনসাথী পাওয়া একজন পুরুষের জন্য মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

Scanned with CamScanner

যে মেয়েটা তোমার কাছে ফোন করেছে, সে আর আমি একই কলেজে পড়তাম। সে আমার এক ক্লাস নিচে পড়তো। তারা আমাদের বাসার পাশেই ভাড়া থাকতো। সে আমাকে আকারে-ইঙ্গিতে নানাভাবে একটা কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতো। আমি এসব বুঝেও না বোঝার ভান করতাম। পারতপক্ষে তার থেকে দূরে দূরেই থাকতাম।

একদিন সে সরাসরি আমাকে প্রস্তাব দিল। আমি ভদ্রভাবে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। সে কিছুতেই মানতে চাইছিলো না। বুঝতে চাইছিলো না। কিন্তু আমারও কিছু করার ছিলো না। আমার পক্ষে এই গুনাহের ডাকে সাড়া দেয়াটা ছিলো অসম্ভব।

আমার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে রেগেমেগে চলে গেলো। যাওয়ার আগে শাসিয়ে গেলো,

-তোমাকে একদণ্ড সুখে থাকতে দিবো না দেখে নিও।

জীবনজাগার গল্পঃ ৪৮২

জানা+জানি!

মানুষটা পাশেই বসা। ব্যাকুলচিত্তে মোবাইলে কথা বলছেন,

-হ্যালো, শোনো! আজ জুমা পড়াতে যাবো না বলে ঠিক করেছি।

আমি বসে বসে 'উসুলে বাযদাবী' কিতাবটার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। ভাইটি ফোন রেখে আক্ষেপ করে বললেন,

-দেখুন তো ভাই! মেয়েছেলেকে নিয়ে আর পারা গেল না!

-কেন কী হয়েছে?

-আজ আমাদের হুযুর বললেন না, মাগরিবের পর ইসলাহী বয়ান হবে!

-জি।

-তাই ভাবলাম আজকে আর বাসায় যাবো না! ঘরওয়ালিকে সংবাদটা জানানোর জন্যে ফোন করলাম! ও বললো, জুমার কথা। আমি বললাম একজনকে দায়িত্ব দিয়েছি। আজ জুমা নেই। ও চট করে বললো, 'জুমা নেই তো কী হয়েছে? 'জিমা'ও কি নেই?' আপনিই বলুন, এমন করে বললে আর থাকা যায়?

আমি কোনও মন্তব্য না করে মিটিমিটি হাসছিলাম। আমাদের উসুলে ফিকহের প্রশিক্ষণ ছিল সাতদিনের। সেই প্রথমদিন থেকেই 'আবদুল্লাহ' (ছদ্মনাম) ভাইকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে আসছিলাম। একে তো তিনি পটিয়াতে পড়াশোনা করার সুবাদে পূর্বপরিচিত। তদুপরি পটিয়া থাকতে একবার বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে, তার কাছ থেকে একটা আমল শিখেছিলাম। আজ ষোল বছর ধরে আমলটা করে আসছি। ভাইটার সাথে দেখা না হলেও প্রতি নামাযের পর যখনই আমলটা করতাম তখনই তার কথা মনে পড়তো। যোগাযোগ ছিল না। ঠিকানাও ছিল না।

আবদুল্লাহ ভাইকে প্রশিক্ষণে দেখে আমি রীতিমতো অবাক! আপনি?

-হাঁ, উসুলে ফিকহটা একটু শিখতে এলাম। বুড়ো বয়েসে একটু নড়াচড়া করতে এলাম আরকি!

সাতদিনের প্রতিদিনই আমরা একসাথে দরসে বসেছি। তাকরার করেছি। মুযাকারা করেছি। বিশাল প্লেটে একপাতে খানা খেয়েছি। প্রথম দিকে তার একটা বিষয় বেশ অবাক লাগতো। আমরা পড়ছি বা পাঠালোচনা করছি, এরই মধ্যে তার ফোন এল, তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মুচকি হাসতে হাসতে ফিরে আলোচনায় যোগ দিলেন। আমরা তার ফোনের জ্বালায় অতিষ্ঠ! কারণ তিনি উঠে গেলেই আলোচনা বন্ধ রাখতে হয়। না হলে আবার শুরু থেকে কথা শুরু করতে হয়।

একদিন একাকী পেয়ে আবদুল্লাহ ভাইকে চেপে ধরলাম। উঁহু! কিছুতেই নারিকেলের খোল ভাঙা যাচ্ছিল না। জোরাজুরির পথ বাদ দিয়ে সমঝোতার পথ ধরলাম। এবার রাজি হলেন,

-আপনার কাছে এত ফোন কে করে?

-অন্য কেউ নয়, ঘরওয়ালী করে!

-বিয়ে করেছেন কতো বছর হলো?

-সাত বছর।

-ছানাপোনা?

-আপাতত তিনটে!

-এত ফোন কেন করে?

-ভাইরে আর বলবেন না, তার ফোনের জ্বালায় আমিও মাঝেমধ্যে অতিষ্ঠ!

Scanned with CamScanner

এখন অবশ্য সয়ে গেছে। বলা ভাল, তার ফোন না পেলে আমার মধ্যেই কেমন যেন অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়।

-আপনি ফোন করেন না?

-করি! ফাঁক পেলেই করি।

-ভাবী ঘরে কি একাই থাকেন?

-একা কেন থাকবে? তিনটা 'পুতলা' আইন্যা দিছি না হ্যারে!

আমাদের তাদরীবের তৃতীয় দিন। আবদুল্লাহ ভাই ভিন্ন এক জামা গায়ে দিয়ে এলেন।

-ভাইজান! এই জামা কেন গায়ে দিলেন? এই কলার ছাড়া, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গোল পাঞ্জাবী তো শর্ষিণা তরীকার লোকেরা পরে?

-আপনি কচুটা জানেন। শোনেন আমি যেখানে থাকি, তার পাশেই একজন মুরুব্বী থাকেন। তিনি একজন আশেকে রাসুল। জীবনের প্রতিটি স্তরে সুন্নাতের পাবন্দি করার চেষ্টা করেন। এমনকি পোশাকটাও?

-পোশাক কিভাবে?

-তিনি নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছেন। বেশ কয়েকবার। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আপনি যখন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন, তখন কেমন পোশাকে দেখেন? তিনি বললেন:

- একেকবার একেক পোশাকে দেখি। তবে প্রায় প্রতিটি স্বপ্নেই, হাবীবের জামায় কলার থাকে না। আর জামাটা 'নেসফ সাক' বা হাঁটু পর্যন্ত গোল থাকে। আর তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত জামাগুলোও অনেকটা এমনই। তবে নবীজি একেকসময় একেকরকম জামা পরতেন। বাড়িতে এসে বিষয়টা জানাতেই আহলিয়া বললো,

-আপনিও এবার থেকে কলারবিহীন নেসফে সাক শেগাফবন্দ পাঞ্জাবী পরবেন। এটা আপনার কাছে আমার আবদার। আপনি নবীজির মতো হয়ে চললে, আমিও চলতে পারবো। উৎসাহ পাবো। আপনি সুন্নত তরীকায় জীবন চালালে আমি পিছিয়ে থাকতে লজ্জা পাবো। আপনার দেখাদেখি আমাদের 'ছাওয়াল'রাও নবীজিকে ভালোবাসতে শিখবে। তবে নবীজির অনুসরণ শুধু জামাতেই সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না!

আপনার ভাবীর কথা ফেলি কিভাবে? যেদিন আমি এই জামা পরি, সেদিন সে অন্যদিনের তুলনায় আমাকে বেশি আদর করে। আমার প্রতি সে রাগ বা

Scanned with CamScanner

অভিমান করলে, আমি এই জামা পরি। আজো আসার আগে সে নিজে থেকেই জামাটা এগিয়ে দিয়ে বললো:

-জামাটা আজ পরুন! আমি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ছি। আপনি পড়বেন। বলা যায় না, যদি 'সৌভাগ্য' নসীব হয়ে যায়!

-আচ্ছা, আবদুল্লাহ ভাই, ভাবী কি মাদরাসা পড়ুয়া?

-আরে, মাদারাসা পড়ুয়া মানে? রীতিমতো মাওলানা। শুধু নামে নয়, কামেও!

-কেমন কেমন?

-আমার বাড়ি পুরান ঢাকায়। আব্বা খাঁটি কুট্টি। মানুষটা বড়ই ভাল ছিলেন। সহজ-সরল। তিনি একটা সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। পাত্রী মাওলানা। আমি তো শুনেই দু'হাত পিছিয়ে গেলাম। ওরে বাবা! কাকে না কাকে ঘরে নিয়ে আসেন! সোজা না করে দিলাম। আব্বা দমলেন না। আমাকে কুট্টি ভাষায় ধৈর্য ধরে বোঝালেন। পাত্রীটা যে অসাধারণ সেটা বললেন। আমি একটাই যুক্তি দিলাম,

-আব্বা! মাদরাসায় পড়ুয়া মেয়েরা স্বামী কথা শোনে না। স্বামীর খেদমত করে না। তারা মা-বাবা থেকে সন্তানকে আলাদা করে ফেলে।

আব্বা বললেন,

-আচ্ছা ঠিক আছে, বৌমা যদি তোরে আলাদা কইরা ফেলে আমার কুনো আপত্তি নাই। তুই আমার কথাডা মাইন্যা ল। আখেরে তোর লাভ অইব।

আব্বার পীড়াপীড়িতে বিয়ে করলাম। বাসর রাতে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। আমি তার মুখ দিয়ে কথা বের করার জন্যে নানা কায়দা কসরত করছি। অনেকক্ষণ পর সে মুখ খুললো। অবাক করে দিয়ে প্রশ্ন করলো,

-আপনে মাদরাছায় কোন কোন কেতাব পড়ান?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কোথায় আদর-সোহাগের কথা বললে, প্রেম-ভালোবাসার বলে রাতটাকে 'ঘন' করে তুলবে, তা না। সে কি না বেরসিকের মতো প্রশ্ন করলো, আমি কী পড়াই? ভোঁতামুখে বললাম:

-নাহুমীর, কাফিয়া, জালালাইন আর তিরমিযী সানী।

-ওম্মা গো! আপনি দাওরা হাদীসে কেলাশ করান? আপনে তো তাইলে বহুত বড় আলেম!

এমন কথা শোনার পর কোন পাগলে মুখ গোমড়া করে থাকে? আমি কৌতূহলী কিশোরীর নিখাঁদ বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। কী বলে উত্তর

Scanned with CamScanner

দিই? আমাকে আরো কাঁপিয়ে দিয়ে বললো,

-তাইলে আমি কিন্তুক আপ্নের কাছে পইরাম!

-তুমি না দাওরা পাশ করেছ?

-জি।

-তাহলে?

-তাহলে আবার কি! একবার পড়লে কি আবার পড়ন যায় না?

-তা যায়! আচ্ছা ঠিক আছে।

-আতীক ভাই! বিশ্বাস করবেন না, 'ও' আমাকে সত্যি সত্যি অবাক করেছে। লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে মনে হয়, সে সুযোগ পেলে অনেক বড় কিছু হতে পারতো। আমি প্রতিদিন মাগরিবের পর 'কিতাব মুতালায়া' করতে বসলে, সেও আস্তে করে আমার পাশে এসে বসতো। আমি একটা শরাহ নিলে, সে আরেকটা শরাহ নিয়ে বসে।আরবীতে সে কাঁচা হলেও উর্দুটা ভালোই বুঝতো। আমি প্রথমেই তিরমিযী শরীফের আরবী শরাহ 'তোহফাতুল আহওয়াযী' নিয়ে বসি। ও নিজে থেকেই 'দরসে তিরমিযী' নিয়ে বসে। আমি আরবীটা শেষ করতে না করতেই সে উর্দুটা দেখা শেষ করে ফেলতো। আগেই জেনে নিতো, আগামীকাল কতটুকু পড়াবো! আমি উর্দুটা হাতে নিতে গেলেই সে বলতো,

-আপনের পড়া লাগবে না, আমি খোলাসাটা আপনাকে শোনাই?

-তুমি?

-জি। আরে শুনেই দেখুন না। ভুল হলে বলে দিবেন। আমি তকী উসমানী সাহেবের কিতাবটা খুব ভালভাবে পড়েছি। আপনার কষ্ট করে কিতাব দেখতে হবে না। আমি আপনাকে প্রতিদিন সারাংশটা শুনিয়ে দেবো। আর জালালাইন কিতাবটা ভালভাবে পড়তে পারিনি। আপনার কাছে ওটা পড়ে নিতে পারবো।

মাগরিবের পরে আমার সাথে পড়তে বসার জন্যে ও আগে থেকেই রান্নাবান্নার কাজ সেরে রাখতো। সবকিছু গুছিয়ে রাখতো। না না, তাই বলে আমাকে 'ঠাণ্ডা' খাবার খাওয়াতো এমন না। এই পর্যন্ত কখনোই আমাকে ঠাণ্ডা 'কিছু' খেতে হয়নি। সেদিকে তার দৃষ্টি খুবই প্রখর।

এখন তো বাচ্চাকাচ্চা তিনটা। মাগরিবের পরে আমার 'মুতালায়ায়' যাতে সামান্যতম ব্যঘাতও না ঘটে সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। ছানাপোনাদেরকে

Scanned with CamScanner

সামলে-সুমলে রাখে। আবার আমার সাথে পড়তেও বসে। পাশাপাশি বড় ছেলেটাকেও পড়াতে বসে।

-আবদুল্লাহ ভাই, আপনি তো 'জান্নাতে' আছেন!

-জি ভাই। আব্বার জন্যে কইলজা ফাইট্টা দু'আ বের হয়। তিনি জোর করে তার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা না করলে, আমি বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম।

এখন আমি যে মাদরাসায় খেদমত করি, সেখানের পাশেই একটা বাসা নিয়েছি। একরুমের। মাদরাসা থেকে সামান্য যা পাই বড় বাসা নেয়ার তওফীক হয় না। কোনও রকমে গাদাগাদি করে আমরা পাঁচজন থাকি। আমি-সে আর তিন বাচ্চা। রান্নাঘর আলাদা। হাম্মামও আছে। পর্দার সমস্যা হয় না। জান্নাতে আছি সত্য, তবে মাঝেমধ্যে বিব্রতকর অবস্থায়ও পড়তে হয়।

-কেন?

-ধরেন কোনও কাজে মাদরাসা থেকে ফিরতে দেরী করেছি। সে অস্থির হয়ে পড়ে। ফোনের পর ফোন করে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে নাকি আমাকে বেশিক্ষণ না দেখে থাকতে পারে না। ফোনে না পেলে বড় ছেলে 'হুযাইফা'কে পাঠিয়ে দেয়। ডেকে নেয়ার জন্যে। ছেলেটাও বড় ন্যাওটা। আমি হয়তো কোনও ক্লাস নিচ্ছি। হুযাইফা স্থান কাল পাত্র ভুলে দৌড়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে,

-আব্বা গো! অম্লেরে মায়ে ডাহে!

পুরো ক্লাশের ছাত্ররা মুখ টিপে হাসতে থাকে। আমি শরমে মরমে মরে যাই। তাকে কতো বোঝাই! আমি তো কাজ শেষ হলেই চলে আসবো। এটুকু ধৈর্য্য ধরতে পারো না!

এই যে এবার উসূলে ফেকাহ পড়তে এলাম এতেও তার আপত্তি! তার কথা হলো,

-সারা বছর ব্যস্ত থাকেন। এখন একটু বিশ্রাম নিবেন। ভালো করে আপনার আদর-যত্ন করবো। আপনি কোথায় 'ছোড পোলার লাহান' পড়তে চলে যাচ্ছেন। এত পড়ে কী হবে, আগে যা পড়েছেন সেটার ওপর আমলের চেষ্টা করুন। উন্নতি করুন! কাজে লাগবে!

Scanned with CamScanner

আমাদের দরস শুরু হয় নয়টায়। শেষ হয় বারোটায়। আসরের পর আরেকটা দরস হয়। আবদুল্লাহ ভাই দরস শেষ হলেই সে কি ব্যস্ততার সাথে বের হয়ে যেতেন! দেখে মায়াই লাগতো! মনে হতো এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন তিনি!

আবদুল্লাহ ভাইয়ের অসংখ্য উর্দু-ফার্সী শে'র মুখস্থ। সবই ইশক-মহব্বত সম্পর্কিত। আমরা প্রশ্ন করেছি,

-আপনি এই শেরগুলো কি ভাবীকেও শোনান?

-আর কারে হুনামু?

-ও আচ্ছা! সেজন্যই তো এমন চুম্বকাকর্ষণ।

-না, শের তো সেও পারে। আমাকেও শোনায়। আমার মনে হয় মাদরাসায় পড়েছে বলেই স্বামীকে এত সম্মান করে। এমন করে গভীরভাবে ভালোবাসে! না হলে দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন বেঁটে বেঢপ মানুষ। গায়ের রঙ খুবই ময়লা। চেহারাও আহামরি কিছু নয়। বেতন পাই কোনওরকম। দেখা যায় কোনও কোনও মাসে একবার মাছ বা গোশত কিনতে পারি না। এমনকি মাদরাসার বড় ছুটিতেও তাকে বাপের বাড়িতে নিতে পারি না। বাড়তি টাকা থাকে না যে! এত অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও 'হে আমারে এমুন কইরা মহব্বত করে' আমি তার 'শুকরিয়া' কিভাবে আদায় করি কন?

আর হ্যাঁ, আবদুল্লাহ ভাইয়ের ফোনবুকে একটা নাম্বার সেভ করে করা আছে 'জানা' নামে। আরেকটা ফোনবুকেও আবদুল্লাহ ভাইয়ের নাম্বারটা সেভ করা আছে 'জানি' নামে।

উসুলে ফিকহের তাদরীব চলেছিল সাতদিন। এই সাতদিনে যদি উসুলে ফিকহের কিছুই না শিখে শুধু আবদুল্লাহ ভাইয়ের রোমান্টিক সংসারের গল্পই শুনতে পেতাম, আফসোস হতো না। আফসোস হচ্ছেও না। তার এমন মধুর সংসারের গল্পটা ছিল বাড়তি পাওয়া।

জীবন জাগার গল্প:৪৮৩

দুলালী ও ডাক হরকরা

সব তালিবে ইলমদের জন্যে বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছিল ঈদের দিন। কিন্তু আমাদের ছিল 'কোরবানীর' দিন। মাদরাসা ছুটি হলেও আমাদের ছুটি নেই। হুজুর সেদিনও পড়তে বসাতেন। এমনকি আসরের পরও। পুরো সপ্তাহ জুড়ে আমাদের মুনাজাতের বিষয়বস্তু থাকতো একটাই, হুযুর যেন এই সপ্তাহ বাড়িতে যান। তাহলে আমাদের অনেক কাজের সুযোগ হয়।

ক. বৃহস্পতিবার জোহরের পর বল খেলা। গোল্লাছুট খেলা।

খ. আসরের পর ভাত উঠিয়ে চরে বেড়ানো। দীঘির পার গিয়ে বসা। শেয়ালের গর্ত খুঁজে বের করা।

গ. মাগরিবের পর দীর্ঘ গল্প-গুজবে বসা। কিছু একটা খেলা। শে'র-কবিতা কাটাকাটি খেলা। ইত্যাদি।

জুমাবারে যে কতো পরিকল্পনা থাকতো, সেটার গল্প বলার জন্যে কমপক্ষে এক ফর্মা লাগবে।

হুযুর যে সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ি যেতেন, সেটাই ছিল আমাদের 'পিক আওয়ার'। এক সপ্তাহ আগে থেকেই আমরা বুঝতে পারতাম আগামী বৃহস্পতিবার কী ঘটতে চলেছে। শনিবার থেকেই চাপা প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেতো হুযুরের। সবচেয়ে সুন্দর পাঞ্জাবীটা ধুয়েমুছে তকতকে করে রাখতে বলতেন। বুধবারে বিকেলে বটতলা গিয়ে কয়লার ইস্ত্রি-মেশিনে দুইটা জামা 'ডলাই' দিয়ে আনতে বলতেন।

শনিবার সকালে আমরা ফজরের পর হুযুরের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, চুপি চুপি। পড়ার ভান করে। কান খাড়া করে রাখতাম খরগোশের মতো। হুযুর ডিম সেদ্ধ করে আনতে বলেন কি না! ডিম তো নয় যেন ঈদের চাঁদ! ডিম সেদ্ধ মানেই হুযুর আগামী বৃহস্পতিবার জোহরের পর আনন্দের অথৈ সাগরে ভাসিয়ে, আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে।

প্রতিদিন একটা করে ডিম। সাথে মধু কালিজিরা। চিরতার পানি। ইসবগুলের ঘন্ন শরবত তো ফরয। কোনও কোনও সপ্তাহে ইসবগুল আর ডিমকে গরম দুধে ভাল করে মিশিয়ে খেতেন। প্রতিদিন রাতে শোয়ার সময় মিষ্টি জর্দা

Scanned with CamScanner

দিয়ে একটা পান। প্রতি নামাযের সময় অত্যন্ত যত্ন করে মিসওয়াক করতেন। ওজু শেষে কামরায় এসে ছোট্ট আয়নায় দীর্ঘ সময় লাগিয়ে পরখ করতেন, কোথাও কোনও ময়লা বা দাগ লেগে আছে কি না। বারবার মুখের কাছে হাত নিয়ে সজোরে শ্বাস ফেলে যাচাই করতেন দুর্গন্ধ বের হয় কিনা। এপরর মুখে এলাচের একটা দানা পুরে, কখনো বা একটা লঙয়ের কোণা পুরে মসজিদে যেতেন।

শনিবার থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন কমপক্ষে আধাঘন্টা সময় লাগিয়ে গোসল করতেন। ভাল একটা সাবান তোলা থাকতো। বিশেষ সপ্তাহেই সেটা খোলস ছেড়ে বাইরে আসার সুযোগ পেতো। সাথে আমাদের একজনকে যেতে হতো। লম্বা একটা সাঁতার দিয়ে হুযুর সিঁড়ির একপাশে বসতেন। শুরু হতো ভেজা গামছায় সাবান মাখিয়ে পিঠ ডলার পালা। ঘষতে ঘষতে হুযুরের পিঠটা লাল হয়ে যেতো। তবুও বলতেন,

-বালা করি চা, ছাতা-টাতা রই গেছেনি কোনও!

পিঠ পরিস্কার করার পর দেখতে হতো পিঠে কোনও ঘামাচি বা অন্য কিছু দাগ আছে কি না? থাকলে সেটা দূর করার চেষ্টা-কসরত চলতো কিছুক্ষণ। এসব করতে অনেক মেহনত-খাটুনি লাগতো! কিন্তু এর বিনিময়ে যে আনন্দের বাহার পাওয়া যাবে, সেটার কোনও তুলনা হয়?

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও ভিন্ন হতো। বেশি করে ভাত খেতেন। মাতবাখ থেকে ডাল যা দিতো, সবটাই ঢকঢক করে খেয়ে ফেলতেন। বাজার থেকে মৌসুমী ফল-পাকুড় কিনে আনাতেন। মাদরাসার গাছ থেকে ডাব কিনে খেতেন। মাঝেমধ্যে পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে কামরায় বাড়তি রান্নাবান্নার আয়োজন করতেন। পুরো সপ্তাহ আর আমাদের পিটুনি খাওয়ার ভয় থাকতো না। আমাদের মেজাজও থাকতো ফুরফুরে।

যতই দিন ঘনিয়ে আসতো, হুযুরের মধ্যে চাপা অস্থিরতা আর মুচকি হাসির বহর বেড়ে যেতো। আসরের পরে আমাদেরকে নিয়ে হাঁটতে বেরোতেন। গল্প করতেন। বুযুর্গানে কেরামের গল্প। নবীগণের গল্প। বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর দিতে বলতেন। বেশ আমুদে আর রসিক সময় কাটতো আমাদের! অন্য সপ্তাহের মতো মাগরিবের পর পড়া ধরার ভয় নেই। পড়া শোনানোর চাপ নেই। হাতের লেখায় বানানে ভুল করলেও বকুনি বা বেতের বাড়ি খাওয়ার আশংকা নেই।

বৃহস্পতিবার এলে হাজারো কাজের চাপ এসে যেতো। সকালে ঘণ্টা শুরু হওয়ার আগেই হুযুর, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে 'হাম্মামে' চলে যেতেন। আমরা এদিকে কাঁচি-আয়না ও ব্লেড হাতে প্রস্তুত থাকতাম। কান পরিষ্কার করার আঙটাও থাকতো। হুযুর ফিরলেই গোঁফ ছেঁটে দেয়া শুরু করতাম। ওটা শেষ হলে কান পরিষ্কার করার পালা আসতো। তারপর হুজুর কিতাব দেখা শুরু করতেন। আমরা হাতের নখ ও পায়ের নখ কেটে দিতাম। অতি যত্নে। পরম শ্রদ্ধায়। এরপর হুযুর অন্য কাজগুলো নিজেই করতেন। তারপর গোসল। অন্যদিনের তুলনায় আজ আরো ভালো করে গোসল করতেন। সাথে করে একটা বালতি নিয়ে যেতাম। হুযুর ডুব দিয়ে উঠতেন। গা-টা ভাল করে ডলে দেয়ার পর, বালতিতে করে টীপকল থেকে পানি নিয়ে আসতাম। হুযুর সেখানে সামান্য আতরের ফোঁটা ফেলে দিতেন। তারপর ভাল করে মিশিয়ে আমরা মগে করে চিকন নালিতে ধীরে ধীর পানিটা শরীরে ঢালতাম। পরম আরামে হুযুর বসে থাকতেন। কখনো বা গুনগুন করে মসনবীর শে'র পড়তেন। কখনো খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব রহ, কখনো আল্লামা ইকবাল! বিরল সময়ে গালিবের শে'রও আওড়াতে শুনেছি!

গোসল শেষ হতে না হতেই ঘণ্টা বেজে যেতো। দুদ্দাড় করে সবাই দরসে চলে যেতাম। অন্যদিন হুযুর কিতাবের সাথে লম্বা একট বেত নিয়ে যেতেন। আজ আর সেটা বের হতো না। হুড়মুড় করে 'ত্রিশমিনিট' করে বৃহস্পতিবারের বিশেষ ঘণ্টাগুলো শেষ হয়ে যেতো! নামাযের আগে দুপুরের খাবার। হুযুর এই বেলা বেশি কিছু খেতে পারতেন না। সামান্য কিছু মুখে দিয়েই হাত ধুয়ে ফেলতেন। একটা খেলাল নিয়ে বসতেন। আয়নায় দেখে দেখে খেলাল করতেন। কখনো বা সুতো দিয়েও দাঁত পরিষ্কার করতেন। কুলি শেষ করে বসতেন আয়না নিয়ে। নাকের পশম ঠিক আছে কি না, হাতের নখগুলো মসৃণ আছে কি না দেখতেন।

জুতোটা ঠিক করতে বলতেন। আমরা তো সেটাকে রীতিমতো আয়নার মতো করে রেখেছি। তবুও হুযুর কিভাবে যেন সেটাতে ধুলোর আস্তরণ আবিষ্কার করে ফেলতেন। অথচ আমরা জুতোর ওপরতলা তো বটেই, সুখতলা পর্যন্ত জিব দিয়ে চাটার মতো পরিষ্কার করে রেখেছি!

নামায শেষ। এবার হুযুর পোশাক পরবেন। প্রথমেই উদোম হতেন। আমরা পাউডার মেখে দিতাম পুরো শরীরে। পোশাক পরতেন অতি সতর্কতার সাথে। কোথাও যেন একটা ভাঁজও না পড়ে। ব্যগ আগেই গুছিয়ে রেখেছি।

Scanned with CamScanner

তবুও শেষ বারের মতো চেক করতে বলতেন। এলাচ দানা দিয়েছি কি না। লঙ আছে তো? আতরের শিশিটা ব্যাগের পকেটে আছে? পাউডার? কুল্লিয়াতে ইকবালটা কোথায়, ওটা দেখছি না যে?

-ওহ! ভুলে গেছি হুযুর!

-সব্বোনাশ! তাড়াতাড়ি করো!

সব প্রস্তুতি শেষ। এবার রেলস্টেশনে। দৌড়ে গিয়ে আগেই একটা রিকশা ডেকে এসেছি। ট্রেনের বেশি দেরী নেই, তাই রিকশা ডাকা। না হয় স্টেশন কাছেই। যেতে না যেতেই ট্রেন এসে যেতো। কোনও রকমে হুযুর উঠে যেতেন। আমরা দৌড়ে দৌড়ে জানলা দিয়ে ব্যাগটা গছিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম। হুযুর মুচকি হেসে জোর গলায় বলতেন,

-শতানি বেশি করিচ্ছা!

তখন সত্যি সত্যি আমাদের খারাপ লাগতো! মনে হতো কী যেন নাই হয়ে গেছে! অথচ হুযুর একদিন পরেই মহা সমারোহে ফিরবেন।

সবসময় দিনগুলো এমনতরো যেত না। জীবন ভিন্নরূপেও এসে ধরা দিত। হুযুরের স্ত্রী বাবার বাড়িতে থাকলে, প্রতি সপ্তাহে তো যেতে পারতেন না। প্রায় মাসে একবার যাওয়া পড়তো। তখন বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারি, হুযুর কেন যেতেন না।

হুযুর বোধ হয় মাদরাসা থেকে প্রতি মাসে বারোশ টাকার মতো পেতেন। তাও দু'তিন মাস বাকী পড়ে যেত। তারপরও হুযুর চেষ্টা করতেন ধারকর্জ করে হলেও একবার 'ও বাড়ি' থেকে ঘুরে আসতে। যখন বকেয়া বেশি পড়ে যেতো, পুরো সপ্তাহের প্রস্তুতিতে ভাটা নামতো। বুধবারে ক্লাশ শেষ করেই হুযুর ছাতা নিয়ে কোথাও চলে যেতেন। আমরা বুঝতে পারতাম হুযুর তার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে টাকা হাওলাত করতে গিয়েছেন। আমরা মাগরিব পর্যন্ত রাস্তার ধারে বসে থাকতাম। দূর থেকে হুযুরকে দেখা যায় কি না। তাঁর হাঁটা দেখেই বুঝতে পারতাম 'ধার' পেয়েছেন কি পাননি! যেদিন দেখতাম হুযুর ছাতা বন্ধ করে ধীরে ধীরে হাঁটছেন, বুঝে যেতাম হয় বন্ধুর সাথে দেখা হয়নি। না হয় করয হয়নি। হুযুরের ভীষণ শুকিয়ে যাওয়া মুখ আর চশমার ভেতরে থাকা 'কেমন কেমন' অসহায়ভাবে চেয়ে থাকা চোখগুলো দেখে, এত কান্না পেত! এত কান্না পেত! মনে হতো চিৎকার করে কাঁদি! আমাদের হুযুর এত গরীব কেন? আমাদের কাছে অনেক টাকা নেই কেন?

আমরা হুযুরকে না জানিয়ে, গোপনে একটা কাজ করতাম। যে সপ্তাহে হুযুর শ্বশুরবাড়ি যাবেন বলে মনে হতো, আমরা কয়েকজন নিজেদের জমানো টাকা, চুরি করে হুযুরের পকেটে রেখে দিতাম। বাজারে পাঠালে আমরা চার টাকার জিনিসকে দুই টাকা দিয়ে কিনে এনেছি বলতাম। বাকি দুই টাকা নিজের থেকে দিয়ে দিতাম। হুযুর বুঝতে পারতেন কি না জানি না। হুযুরের টাকা জমানোর একটা ব্যাংক ছিল, হাত একদম খালি হয়ে গেলে, হুযুর সেটা ভাঙতেন। আমরা সময় সময় সেটাতেও টাকা ফেলে রাখতাম। কতোই বা ফেলতে পারতাম! আমাদের কাছেও অত টাকা থাকতো না!

মাগরিবের পর হুযুর কিতাব নিয়ে বসতেন। বারবার কিতাবের পাতা ওল্টাতেন! কিছু পড়তে পারতেন বলে মনে হয় না। বারবার জানলা দিয়ে ওপাশের বড় পুকুরের পানিতে মাছের ঘাই দেখতেন অন্ধকারে। রাতে ভাত খেতেন না। এশার নামায পড়েই খাতা-কলম নিয়ে বসতেন। চিঠি লেখার বিশেষ একটা প্যাড ছিলো। নীল রঙের। মধ্যখানে ফুলের ছাপ দেয়া। আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে প্রায় সারা রাত জেগে হুযুর চিঠি লিখতেন। হুযুর কখনো তাহাজ্জুদ বাদ দিতেন না। চিঠি শেষ করে নামাযে দাঁড়াতেন! চিঠি লেখার দিনটাতে হুযুর মুনাজাতে এমন হাউমাউ করে কাঁদতেন, আমাদের মতো ছোট মানুষটিও বুঝে যেতাম! এই কান্নায় শুধু খোদাপ্রেমই নয়, অন্যপ্রেমও আছে।

চিঠি লেখার সপ্তাহটা কষ্টের হলেও আমার জন্যে কিঞ্চিত আনন্দেরও ছিল বৈকি! কারণ চিঠিটাতে আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে! হুযুর যেতে না হয় কিছু টাকা প্রয়োজন হয়, শ্বশুরবাড়িতে জামাই যেতে যা লাগে আরকি! কিন্তু চিঠি নিয়ে যেতে তো খরচ লাগে না। শুধু ভাড়ার টাকাটা হলেই হয়।

বৃহস্পতিবারে জোহর পড়েই, বিমর্ষ হুযুর কিছুর সরস হয়ে উঠতেন। আমাকে ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে প্রস্তুত করতেন। শ্বশুরবাড়ির দিকের কিছু ছাত্রও মাদরাসায় পড়ে। তারা প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যায়। তাদের কারো সাথে আমাকে পাঠাবেন। এমনটাই ঘটে সবসময়। হুযুর সাথে করে স্টেশনে নিয়ে যেতেন। নিজেই ট্রেনে উঠে আমাকে বসিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। একদম ট্রেন ছাড়ার মুখে মুখে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিয়ে বলতেন:

-তোমার খালাম্মাকে দিও। আর কারো হাতে দিও না!

হুযুর নেমে পড়তেন ট্রেনের হুইশেল দিলেই। সাথে সাথে চলে যেতেন না। আমি জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখতাম যতক্ষণ দৃষ্টিসীমায় ট্রেন থাকে, হুযুর দাঁড়িয়ে থাকতেন!

Scanned with CamScanner

একবার চিঠি নিয়ে যাচ্ছি। যে বড় ছাত্রটির সাথে আমাকে হুযুর পাঠিয়েছিলেন, সে ছিল চঞ্চল প্রকৃতির। তার আবার বিশেষ শখ হলো ট্রেনের ছাদে চড়ে যাওয়ার। তার সুবিধে মতো ছাদে চলে গেলো। আমাকে রেখে গেলো তার ব্যাগের কাছে। আমি বসে আছি! এমন সময় এক লোক এলো। কেমন যেন দৃষ্টি! সন্দেহজনক। নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলো। একথা সেকথার ফাঁকে আমার নাড়ি নক্ষত্র সব জেনে ফেললো। এটাও জানলো আমি হুযুরের চিঠি নিয়ে যাচ্ছি। লোকটা বেতমিজের মতো বললো,

-খোকা! চিঠিটা ঠিকমতো রেখেছো তো! না হলে হারিয়ে যাবে! যা ভীড় ট্রেনে! তুমি এক কাজ করো, চিঠিটা আমার কাছে দিয়ে দাও! নামার সময় দিয়ে দেবো!

আমি যতই না না করি, ব্যাটা ততই জোর করতে থাকলো! একপ্রকার জোর করেই নিয়ে নিল চিঠিটা! বেহায়ার মতো চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে দিল! বেশ আওয়াজ করে!

আমার দুলালী!

এমাসেও আসতে পারলাম না! কারণ আর কী বলবো, তুমি তো জানোই! আমি চেষ্টার কমতি করিনি! কিন্তু কোথাও টাকার যোগাড় হলো না! তুমিও তো হুযুরের মেয়ে। তুমি বুঝবে! গতবার আসার সময় তোমাকে কিছু দিয়ে আসতে পারিনি শুধু নাকের ওপর.......................!!!

এ-পর্যন্ত পড়ে লোকটা থামলো! বেমক্কা প্রশ্ন করলো:

-কি রে তোর হুযুর কি হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে?

-কেন হিন্দু বিয়ে করবে কেন? মুসলমান বিয়ে করেছে!

-ধুর বোকা! মুসলমান মেয়ের নাম আবার 'দুলালী' হয়?

কতোদিন হয়ে গেছে, আজো ঘটনাটার কথা মনে হলে হাসিও পায় আবার রাগও হয়। জীবনে যে কয়বার মাথায় খুন করার মতো রাগ চেপেছিল, সেবার ছিল তার প্রথমবার! অত ছোট বয়েসেও। বেহায়া লোকটা কিভাবে করতে পারলো এমন কাজ?

ট্রেন থেকে নামলে বাড়ি যাওয়ার জন্যে রিকশায় চাপতে হতো। গ্রামের মেঠো পথ। হেঁটেই যায় সবাই। তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্যে রিকশা নেয়া। অনেক দূউর থেকে বাড়িটা দেখা যেতো। হুযুরের স্ত্রী মাসের হিশেব থেকে বুঝতে পারতেন এ-সপ্তাহ 'তিনি' আসবেন! তাই দুপুরের পর থেকেই উত্তর দিকের

পুকুর পাড়ে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন! রাস্তার মোড় পার হয়ে রিকশা যখন বাড়ির সামনের দিকে আসতো টের পেতাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আড়ালে কোথাও! আমাকে দেখে তার অতিপবিত্র নিষ্পাপ মুখখানা মুহূর্তেই শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে যেতো! আশাভঙ্গের ধাক্কা সামলাতে বেশ বেগ পেতে হতো। আমাকে আড়াল করে, শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতেন। আবার আমার প্রতি অবহেলা যাতে না হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ণ নযর থাকতো! কেউ দেখে ফেলার আগেই টুক করে চিঠিটা দিয়ে দিতাম। তিনি সেটা অতি দ্রুত 'নির্দিষ্ট' স্থানে রেখে দিতেন। তারপর আমার হাত ধরে ঘরের দিকে রওয়ানা দিতেন।

হুযুরের স্ত্রীর ভাবীরা ছেঁকে ধরতো! চিঠিটা বের করার জন্যে। তিনি অত সহজে দমবার পাত্রী নন! ভাবীরা জানতেন চিঠিটা কোথায় লুকানো হয়েছে! কিন্তু সবার সামনে ওখান থেকে নেয়াও যায় না! তাই ওনাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে ফেলতেন!

শনিবার ভোরে ভোরে চলে আসতে হবে। বৃহস্পতিবারে আসার পর থেকে, আদর-আপ্যায়নের যে বহর, তাতে মনে হতো, জামাই হুযুর নন; আমিই জামাই! কতো কী রান্না করতেন! কতো আদর-সমাদর করে হুযুরের শাশুড়ী এটা-সেটা পাতে তুলে দিতেন! ছোট্ট ছিলাম বলে ভাবীরা সে কি মশকরা করতেন!

শুক্রবার রাতে ও-বাড়ির কেউ ঘুমুতেন বলে মনে হয় না। পরদিন সকালের ট্রেন যেন ধরতে পারি, হুযুরের শ্বশুর রাতেই একটা পরিচিত রিকশাকে বলে রাখতেন। আর মহিলারা রাত জেগে পিঠাপুলি বানাতেন। মোরগ জবেহ করতেন। সকালে আমাকে ভাল করে খাইয়ে সাথে দিয়ে দিতেন ঢাউস এক টিফিন ক্যারিয়ার! আর প্লাস্টিকের ব্যাগে হরেক রকমের পিঠা ও নাশতা।

দুই ভাবী ওনার সাথে একেবারে লেপ্টে থাকতো! উনিও ভীষণ চালাক! একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় হাওয়া না কোত্থেকে যেন চিঠিটা বের করে দিতেন! ভীষণ কান্নামাখা দৃষ্টিতে বিদায় দিতেন। তার স্বামীর কথাই মনে পড়ে যেতো হয়তো বা!

মাদরাসায় পৌঁছলে, হুযুর একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকতেন। কে কী বলেছে? 'উনি' আর কিছু বলেছেন কি না! এ-কথাবার্তার মধ্যেই হুযুর চিঠিটা বার দশেক পড়ে ফেলেছেন! কমপক্ষে আগামী এক সপ্তাহ প্রত্যহ চিঠিটা না হলেও পঞ্চাশবার পড়বেন! আমাদেরকে লুকিয়ে! গভীর রাতেও পড়তে দেখেছি! হুযুরের চোখের কোণটা চিকচিক করতেও দেখেছি কি?

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্প : ৬৮৪

বিবাহিত নেশাচুর

রশীদ সাহেব একজন টেক্সটাইল ম্যানেজার। দেশে পড়াশুনা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া থেকেও টেক্সটাইল বিষয়ক উচ্চ ডিগ্রি নিয়েছেন।

অন্য আর দশজনের মতো তিনি বিদেশে থেকে না গিয়ে, লোভনীয় বেতনে চাকরির মায়া উপেক্ষা করে, দেশে ফিরে এসেছেন।

দেশে ফিরে প্রথম প্রথম বেশ কষ্টেই পড়ে গিয়েছিলেন। কোথাও ভালো চাকরি জুটছিলো না। পরিবারের সবাই তো সারাক্ষণ কানের কাছে বলে যাচ্ছিলো,

- কেন ফিরে এলে? ওখানে থেকে গেলেই পারতে।

রশীদ সাহেবেরও একসময় মনে হতে লাগলো, ফিরে এসে ভুলই করলাম কিনা?

বেশিদিন এ অচলাবস্থা থাকলো না। আরেকজন বন্ধুসহ নিজেরাই একটা ব্যবসা শুরু করে দিলেন।

এটা আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা। তখনকার ত্রিশ বছরের যুবক রশীদ আজকের পঞ্চশোর্ধ রশীদ সাহেব।

রশীদ সাহেব বিদেশ থেকে উন্নত লেখাপড়ার পাশাপাশি একটা অনুন্নত ব্যাপারও সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।

তা হলো মদের নেশা। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারেননি। ভাগ্য ভালো, নেশাটা মাত্রা ছাড়ায় না কখনো।

বিয়ের প্রথম দিকে এ নিয়ে প্রায়ই খিটিমিটি লেগেই থাকতো। পরে আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কমে আসলেও শাহিদার মনে এখনো ক্ষোভ রয়ে গেছে।

সেটা মাঝে মধ্যে কথাবার্তায় ফুটে ওঠে। রশীদ সাহেবের স্ত্রী শাহিদার কথা হলো,

-যারা নেশা করে তারা সবই করতে পারে। নেশা হলো পাপের চাবি। তোমরা যেখানে নেশা করো, সেখানে কি শুধু পুরুষই থাকে? আমি তো শুনেছি অনেক নারীও সেখানে যায়।

শাহিদার মূল আপত্তি সেখানেই। নেশা করছো সেটা একা একা করছো। কিন্তু সেটার পাশাপাশি অন্য পাপে জড়িয়ে যাওয়ার আশংকাও তো ফেলে দেয়া যায় না।

আমি তো ঘরে বসে সব দেখতে পাই না। কিন্তু খবর পেয়েছি, তোমরা সেখানে শুধু মদই খাও না। অন্য কিছুও করো।

রশীদ সাহেব স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়েও নিঃসংশয় করতে পারেননি।

আজকের সাপ্তাহিক পার্টি শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেলো। আজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মদ্যপানের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছে। যা আর কখনো হয়নি তাই আজ হলো। রশীদ সাহেব নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। ঢুলেঢুলে বাসায় ফিরলেন।

ড্রইংরুমে এসেই বমি করে সব ভাসিয়ে ফেললেন। এরপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

সকালে ঘুম ভাঙলে রশীদ সাহেব ভয়ে ভয়ে চোখ খুললেন। দেখলেন গায়ে নাইট গাউন পরানো। মেঝের বমি পরিষ্কার।

রুম থেকে বের হলেন। সবকিছু গোছানো। খাবার টেবিলে সকালের নাস্তা সাজিয়ে রাখা আছে। ওখানে পিরিচ চাপা দেয়া একটা চিরকুট পেলেন,

'আমি বাজারে গেলাম, নাস্তা খেয়ে নিও'।

রশীদ সাহেবের কাছে সবকিছু অবিশ্বাস্য ঠেকছিলো। মেয়েকে ডেকে ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করলেন।

-মা-মণি! এই জাদু কিভাবে হলো? আমি তো ভেবেছিলাম আজ ঘরে প্রলয়ংকরী কাণ্ড ঘটে যাবে। তুমি কি কিছু জানো?

-আমি কিছুই জানি না। রাতে যখন আম্মু আর আমি ধরাধরি করে খাটে শোয়াতে গেলাম তখন তুমি বেহুঁশ অবস্থাতেই বলে উঠলে,

-আমাকে ছুঁবে না। আমি বিবাহিত। আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি।

Scanned with CamScanner

জীবন জাগার গল্পঃ ৬৮৫

হালাল প্রেমিক!

এক.

বর্ষাকালে গ্রামের পথঘাট হাঁটুসমান প্যাচপ্যাচে কাঁদায় ভরে যেতো। হুযুরের বাড়ি ছিল মাদরাসার পাশেই। শ্বশুরবাড়িও বেশি দূরে নয়। পুরুষ হলে হেঁটেই যাওয়া যায়, মহিলাদের জন্যে রিকশার ব্যবস্থা করতে হয়। নৌকা করেও যাওয়া যায়, কিন্তু সময় বেশি লাগে! বিশেষ এক উপলক্ষ্যে হুযুরের স্ত্রীর বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। পরিচিত রিকশা ডেকে আনা হলো।

বর্ষাকালে গ্রামের রাস্তায় রিকশা একটা চালানো যায় না। কিছু কিছু জায়গায় দু'জন লাগে! হুযুর আমাকে সাথে নিলেন। রাস্তা বেশি খারাপ হলে ধাক্কা দেয়া লাগবে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেলো, রাস্তা ধারণার চেয়েও বেশি খারাপ! কয়েক স্থানে আমি আর রিকশাচালক দু'জন মিলেও রিকশা নড়াতে পারিনি! হুযুরও নেমে এসে হাত লাগিয়েছেন। হুযুরের স্ত্রীকে আমরা আম্মাজান বলতাম। আমাদের কষ্ট দেখে তিনিও নেমে পড়তে উদ্যত হলেন। হুযুর নিরস্ত করলেন।

আম্মাজানকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম। হুযুর আগামীকাল সকালে এসে ঘণ্টা ধরবেন। আম্মাজান থাকলে আমাদের একটা সুবিধে হতো, বাসা থেকে তরকারি পাঠাতেন। বর্ষাকাল যেহেতু, -বুঝতে পারছিলাম- ওনার ফিরতে বেশ দেরী হবে। ততদিন আমাদেরকে 'পাতলা' ডালের ওপর দিয়েই ভাত সাঁটাতে হবে। উপায় নেই।

সপ্তাহখানেক এভাবে চলে গেল। হুযুরের ঘরের কাঁচাবাজারের দায়িত্ব ছিল আমার কাছে। হুযুর একদিন বিকেলে বাজার করে আনতে বললেন। মনে কৌতূহল হলেও প্রশ্ন করার জো নেই। ঘর তো খালি, বাজার কেন? মনের প্রশ্ন মনে রেখে বাজার এনে দিলাম। রাতের খাবারের আগে বাসা থেকে তরকারি হাজির! আমরা অবাক! কী রে! কে তরকারি পাকাল? আম্মাজান তো ও-বাড়িতে! শুরু হলো তদন্ত! হুযুরের ছোটভাই ছিলো আমাদের সহপাঠী! ধরে বসলাম!

-ব্যাপার কী?

Scanned with CamScanner

-কোন ব্যাপার?

-আম্মাজান কোথায়?

-কেন, আমাদের বাড়িতে!

-কবে এলেন?

-গতকাল এসেছেন বলে শুনেছি!

-কে এনেছে?

-ভাইয়া?

-কখন, আমরা টের পেলাম না যে?

-তা তো জানি না! ঠিক আছে খোঁজ নিয়ে জানাব!

আমরা কৌতূহলে ফেটে পড়ছি! কখন এই ঘটনা ঘটলো? পরদিন জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটলো। ছোটভাই এসে জানাল,

-ভাবীর সাথে তো দেখা দেয়া যায় না, আমার ছোটবোনকে দিয়ে রহস্যটা ভাঙার চেষ্টা করেছি। ও এসে জানালো তাতে আমার চোখ কপালে!

-কী ঘটেছে ভূমিকা বাদ দিয়েই বলে ফেল না, কেন ফেনাচ্ছিস!

- তোরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলি, হুযুর চুপিচুপি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির! ভাবী বলেছেন,

-রাত তখন বারোটা কি একটা। বাইরে ফকফকা চাঁদের আলো। আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! জানলায় টোকার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। পরে ওনার '....দা' ডাক শুনে রীতিমতো আকাশ থেকে পড়লাম! জিন টিন নয়তো! উঁকি মেরে দেখলাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে! নাহ্, তার মতোই তো লাগছে! আমি ভেতর থেকে আওয়াজ দিলাম। কথা বললাম। তারপর নিশ্চিত হয়ে খিড়কি খুললাম। ভেতরে এসেই বললো,

-চলো! চলো!

-কোথায়?

আমার সেকি লজ্জা! এতরাতে আম্মুকে কিভাবে বলি, উনি এসেছেন! সাথে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? উনিও নাছোড়বান্দা! আমাকে ছাড়া একপাও নড়তে নারাজ! অগত্যা আর কী করা! লজ্জার মাথা খেয়ে আম্মুকে এটা সেটা বলে ছাড়পত্র নিলাম। আব্বু জেগে গেলে শরমের শেষ থাকবে না! ইশ!

সবাই কী যে ভাববে! মানুষটা কেন যে মাঝেমধ্যে এমন পাগলামি করে! বয়েস তো কম হলো না!

হুযুর তখন পঁয়তাল্লিশ পেরুনো পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই! এই বয়েসেও এমন 'টক'! ভরা যৌবনে না জানি কেমন ছিলেন! সেটা জানার উপায় আছে! মা-শা আল্লাহ!

দুই.

নতুন বিয়ে করেছেন। বিয়ের আগে সারাক্ষণ মাদরাসাই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান জপ। এমনকি ছুটিছাটা হলেও বাড়ি যাবার নামটি পর্যন্ত নিতেন না। সারাক্ষণ তালিবে ইলমদের নিয়ে মেহনত করছেন। মাদরাসার বাজার সদাই করছেন। পুকুরে বেড় দিয়ে মাছ ধরাচ্ছেন। মাদরাসার নির্মাণাধীন নতুন ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের জন্যে ছোটাছুটি করছেন। তার এক কথা, জীবনটা মাদারাসার জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছি। দ্বীনের খেদমত এভাবেই করতে চাই! বিয়ে শাদি করতে পারলে ভাল, না হলে নাই। আমরা আড়ালে মুচকি মুচকি হাসতাম। আর বলতাম,

-ঠিক আছে দেখা যাবে!

ধারকর্জ করে বিয়ে করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। প্রথম প্রথম সেকি লজ্জা! জোর করেও শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো যায় না। গেলেও শ্বশুরবাড়ির অদূরে মসজিদে বসে থাকেন। কেউ একজন এগিয়ে এসে না নিয়ে গেলে, আবার ফিরতি পথ ধরেন। এমন ঘটনা দুইবার ঘটেছে। শরমের কারণে মসজিদ থেকেই ফিরে এসেছেন।

আস্তে আস্তে দিনবদল হলো। লজ্জার পরিমাণ কমে এল। স্ত্রীকে এখনো তুলে আনা হয়নি। জামাইর ঘরদোর নেই। কোথায় এনে তুলবেন? আগে যে মানুষকে মাদরাসার বাইরে কোথাও দেখা যেত না, আজকাল তাকে বৃহস্পতিবার যোহরের পর আর খুঁজে পাওয়া দায়!

শনিবারে মাদরাসায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কোনওরকমে ক্লাস ধরেন। পড়াশুনাতেও কেমন যেন প্রাণ নেই। আগের মতো হাশিখুশি ভাব নেই। সারাক্ষণই কী যেন ভাবেন! একদিন আমরা ধরে বসলাম,

-আপনার হয়েছেটা কি বলুন তো!

-কই না তো! কিসসু হয়নি!

Scanned with CamScanner

-হয়েছে তো বটেই। বেশ বড় ধরনের কিছু হয়েছে!

প্রথমে না না করে শেষে মুখ খুললেন:

-'ওকে' ছাড়া আমার মোটেও মন টেকে না। সারাক্ষণই তার কথা মনে পড়ে। মনে হয় কী নেই, কী নেই! বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা!

-আপনি না বলেতেন, সারাজীবন মাদরাসার খেদমত করেই জীবন কাটিয়ে দেবেন! এখন এই উল্টো যাত্রা?

-ভাই আমি কী করবো! মনকে মানাতে পারি না যে! আর আমি কি কখনো বলেছি, মাদরাসা ছাড়বো! আমার শুধু তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তাকে কাছে পেতে মন চায়। তাকে ছেড়ে যখন মাদরাসায় আসি দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়! সে জোর করেই আমাকে মাদরাসায় পাঠায়!

অবস্থা দিনদিন গুরুতর হতে শুরু করলো। আমরা চেষ্টাচরিত্র করে ওনার জন্যে শ্বশুরবাড়ির পাশেই এক মাদরাসায় খেদমতের ব্যবস্থা করে দিলাম। সমাধান হয়ে গেলো। এই মাদরাসাতেই তাকে রেখে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আশেপাশে যুৎসই ভাড়াবাড়ি পাওয়া যায়নি।

তিন.

তিনি বাঙলা বলতে পারেন। পড়তেও পারেন চমৎকার! কিন্তু সুন্দর করে লিখতে পারেন না। এদিকে ওনার স্ত্রী আবার চমৎকার সব চিঠি লিখেন। একপক্ষ লিখলে আরেক পক্ষকে উত্তর দিতে হয়! টুকটাক বাঙলা বইপত্তর পড়ি, অন্ধবনে কানারাজার মতো বাজারে রটে গেলো,

-উনি বাঙলার জাহাজ!

লোকমুখের জনশ্রুতি শুনে তিনি একদিন আসরের পর মসজিদ থেকে কামরায় ফেরার পথে ধরে বসলেন,

-ভাই! আমার একটা কাজ করে দিতে হবে!

-কী কাজ!

-আপনার জন্যে তেমন কঠিন কিছু নয়! চিঠি লেখা!

-ও আচ্ছা! ঠিক আছে!

আমি বেশ উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জীবনে কখনো নিজের জন্যে চিঠি লেখার সৌভাগ্য (!) হয়নি, এখন দুধের স্বাধ ঘোলে মেটানো যাবে!

Scanned with CamScanner

জীবনের বাঙলা বই তো দূরের কথা, স্কুলের ত্রিসীমানায় পা-মাড়াননি তিনি! কিন্তু চিঠিতে কী লিখতে হবে, সেটার ডিকটেশন শুনে আমার চক্ষু ছানাবড়া! এমন চিঠি যদি বিশ্বসুন্দরীকেও দেয়া হয়, আমি শতভাগ নিশ্চিত: কুপোকাৎ হয়ে যাবে! কতল হয়ে যাবে! ফেদা হয়ে যাবে!

আর মা-শা আল্লাহ! ও পক্ষও কম যায় কিসে! এদিক থেকে রকেট গেলে ওদিক থেকে মিসাইল আসে! অথচ প্রতি বৃহস্পতিবারেই দু'জনের দেখা হয়। তবুও এক সপ্তাহের বিরহেই এত আবেগ কোত্থেকে আসে! তাও বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর পর্যন্ত? এও এক রহস্য! আসলে স্ত্রীকে বা স্বামীকে ভালোবাসতে জানতে হয়। ভালোবাসা দিতেও জানতে হয়, আদায় করতেও জানতে হয়। ভালোবাসা ধরে রাখতেও জানতে হয়। এটা কেউ কেউ জন্মগতভাবেই শিখে আসে, কেউ ঠেকে ঠেকে শিখে থাকে! ওনার চিঠি লেখা নিয়ে অনেক মজার স্মৃতি আছে।

চার.

কক্সবাজারে বীচের একদম কাছেই একটা হোটেলে উঠেছি। সাগরের কাছে গেলে, অন্য কোনও কাজ শোভা পায় না। সাগরের কাছে থাকাই অবশ্য কর্তব্য। সাগর ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ পাল্টায়। সাগরের রূপ সকালে এক রকম। দুপুরে এক রকম। বিকেলে একরকম। গোধূলিবেলায় আরেক রকম! সবচেয়ে মোহনীয় সময়ও বটে! লাল টকটকে সূর্যটা অথৈ জলরাশির মধ্যে টুক করে হারিয়ে যায়! ভেতরে কোথাও যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। রাতের সাগর আরও রহস্যময়। আর ভোররাতের সাগর! সেটা ভাষাতীত!

আমরা আমাদের মতো সাগর নিয়ে বুঁদ হয়ে আছি। আশেপাশের ঘটনা খেয়াল করার সময় কোথায়! তবুও চোখে পড়লো, আমাদের পাশের রুমেই এক হুজুর দম্পতি এসেছেন। আমাদের পরদিনই। তাদেরকে খুব একটা বেরোতে দেখি না। হরবক্ত রুমস্থ হয়েই দিন গুজরান করছেন। সেটা দোষের কিছু নয়। নতুন নতুন এমন হয়। খাবার-দাবারের খেয়ালও থাকে না। ব্যলকনি আমাদের লাগোয়া হওয়াতে দেখি, সারাদিনই ভেজা কাপড় রশিতে ঝুলছে। তাও এক কাপড় নয়। সারাদিনে প্রায় পাঁচ-ছয় প্রস্থ! মা-শা আল্লাহ! বেশ তাগড়া ভালোবাসা!

চাপা কৌতূহল থাকলেও 'দুর্গেশনন্দ ও নন্দীনি'কে ধরার কোনও উপায় ছিল না। কখন খেতে যান, তখন ধরার জন্যে তক্কে তক্কে থাকলেও সুবিধে করা

Scanned with CamScanner

যায়নি। এরমধ্যে একটা ঘটনা তাদের প্রতি আগ্রহের পারদ চড়চড় করে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা সমুদ্রস্নান সেরে ফিরছি! পাশের কেবিনের দরজা সামান্য ভেজানো। দুই রুমের দরজা পাশাপাশি! তালা খুলতে খুলতেই প্রতিবেশি রুম থেকে জীবনস্পন্দনের মৃদুধ্বনি কানে এল। একটা বাক্য শুনে ভীষণ চমকে গেলাম। হুযুর বেশ পরিস্কার চোস্ত মার্কিন উচ্চারণে বললেন,

Here's Looking At You, Kid

হুযুর এই ঐতিহাসিক বাক্য কোথায় পেলেন? আমি স্বগতোক্তি করে উঠলাম। প্রতিটি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু বিখ্যাত উক্তি থাকে। হলিউডের সর্বকালের সেরা একশটি উক্তির মধ্যে উপরের উক্তিটা দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। উক্তিটা করেছে হামপ্রে বোগার্ট। মাইকেল জ্যাকসনকে যে সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছে, সেখানে এই বোগার্ট মশায়ও সমাহিত! হুযুরের মুখে বোগার্টের 'ডায়লগ'? কোনওভাবে ট্রেস করতে না পেরে, একটু বাঁকা পথে যেতে হলো। রিসেপশনে একটু খাতির জমিয়ে বের করা গেলো, হুযুর আমেরিকান পাসপোর্টধারী। বাঙালি বংশোদ্ভুক্ত! স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঘুরতে এসেছেন!

কিছুটা ধোঁয়াশা কাটলো! এবার কৌতূহল বোগার্টকে ছেড়ে সঙ্গিনী 'ইনগ্রীড বার্গম্যানের' দিকে ছুটলো! কিন্তু সর্বাঙ্গ বোরকাবৃতার পরিচয় কিভাবে উদ্ধার করি! একবার বাগে পেয়েছিলাম দু'জনকে! হাত ধরাধরি করে হোটেলে ফিরছেন। সিনর বোগার্ট মশায় লম্বা জুব্বা পরিহিত আর সিনোরিটা ইনগ্রীড আপাদশির 'কালোপুটলি'! মায় চোখ পর্যন্ত! বেজায় হতাশ! একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম বেহায়ার মতো, আলাপ জমাতে! কিন্তু তারা বেজায় চালাক! হনহন করে চলে গেলো! একদিন শুনি, তারা চলে গেছেন! জীবনের এক অমীমাংসিত রহস্যই থেকে গেলো! এমন শিল্পরসিক হুজুরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে না পারার একটা অতৃপ্তিও পাশাপাশি রয়ে গেলো! হয়তো বিড়বিড় করছেন,

-এজ ডে'জ গোজ বাই!

ঘটনা যাই হোক! হুযুর দম্পতির এমন 'পজেটিভ লাভ' দেখে ভীষণ ভালো লেগেছিল! ভালোবাসাকে নানা অপাত্রে বিলানোর চেয়ে একটা হালাল পাত্রের জন্যে জমা করে রাখাই তো উত্তম! বিয়ের পর 'লাভ বটল' খুলে আস্তে আস্তে বিতরণ করাই যুক্তিযুক্ত! আর বিয়ের আগে হুযুরদের ভালোবাসা বিলোনোর

Scanned with CamScanner

সুযোগও কম! তাই গুনাহের অবকাশও কম থাকে। বিয়ের পর এতদিনকার অবদমিত ভালোবাসাই দু'কূল ছাপিয়ে উপছে পড়ে!

মাদরাসাজীবনের পরতে পরতে, এমন অসংখ্য হালাল মহব্বতের কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সব বলতে গেলে দিন ফুরোবে, কথা ফুরোবে না!

তবে ভালোমন্দ সব জায়গাতেই আছে। হুযুর হলেই নিরংকুশ ভাল, অ-হুজুর হলেই নিরংকুশ খারাপ, সিদ্ধান্তকে এতটা সরলীকরণ করে ফেলা ঠিক নয়। মাদরাসাজীবীরা পাপের সুযোগ কম পায় বলে কমপাপী আর সুযোগ পেলে বেশিপাপী কিনা সেটাও মাথায় রাখতে হবে!

জীবন জাগার গল্পঃ ৪৮৬

স্মৃতিমাখা গালিচা!

ঘটনাটা কয়েক দশক আগের। নিকোলাস ফিলিপ। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। থাকেন প্যারিসের অভিজাত এলাকায়। সদ্য চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। চাকুরিজীবন শেষ হওয়ার কিছুদিনের মাথায় স্ত্রী মারা গেছেন। বিপত্নীক হওয়াতে এখন তিনি ঝাড়া হাত-পা। একটা কন্যা সন্তানের জনক। মেয়ে অলিভিয়া বেশ ভাল মেয়ে। কাজেরও। বাবাঅন্তপ্রাণ।

চাকুরির শেষ দিকে তিনি মাগরিব বা মরক্কো নিয়ে পড়াশোনা করা শুরু করেছিলেন। পরিবারের সদস্যদের কৌতূহলের অন্ত নেই! তিনি এতকিছু ফেলে মরক্কো নিয়ে পড়লেন? মশিয়েঁ ফিলিপ সবাইকে বুঝ দিয়েছেন।

-আমি তরুণ বয়েসে সেখানে ছিলাম না! আমার প্রথম পোস্টিং মরক্কোতেই ছিল, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন!

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই মরক্কোতে ফরাসিদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। ১৯১২ সালে আনুষ্ঠানিক সামরিক আগ্রাসন শুরু হয়েছিল। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মরক্কোতে ফরাসি উপনিবেশ ছিলো। আলজেরিয়া ও মরক্কোতে ফরাসিদের একটা চোখ সবসময় 'বারবার' জনগোষ্ঠীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। আরবীতে এদেরকে 'আমাযীগ' বলা হয়।

আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলামী হুকুমত বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল 'আমাযীগ'দের। তারিক বিন যিয়াদ (রহ.), ইউসুফ বিন তাশাফীন (রহ.), বিশ্বের সর্বপ্রথম বিমানের চিন্তার উদ্ভাবক আব্বাস বিন ফিরনাস, ইবনে খালদুন, ইবনে বতুতা, ফরাসী বিরোধী মহান মুজাহিদ আবদুল করীম খাত্তাবী

ও মহান মুজাহিদ আল্লামা আবদুল হামীদ বাদীস (রহ.) প্রমুখ ছিলেন এই জাতিগোষ্ঠীর।

নিকোলাস ফিলিপ তার গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্যে একজন সহকারী খুঁজছিলেন। ফরাসি জানে পাশাপাশি মরক্কোর বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও জানে! স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বেশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। তাই আরো বেশি মরক্কোর নেশার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন।

বাবাকে দিনরাত এই একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে অলিভিয়া বেশ অবাক হলো। বাবা একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা। তার মত লোকেরা অবসর নেয়ার পর কত সুন্দর করে জীবন কাটায়! তিনি কি না, এক অপরিচিত দেশ নিয়ে মেতেছেন! বলি বলি করে সুযোগ মেলে না। স্বামীসন্তানসহ বাবার বাসারই উপরতলার ফ্ল্যাটেই থাকে অলিভিয়া। এক ছুটির দিনে মশিয়েঁ ফিলিপ মেয়েকে কল করলেন।

-বাবা! কিছু বলবে?

-হ্যাঁ, একটা কিছু বলার জন্যেই তোকে ডাকা! আমি তোকে একটা চাবি দিয়েছিলাম। ব্যাংক লকারের! কোথায় সেটা?

-আছে, আমার কাছেই! তোমার কথামত আমি কাউকে সেটার কথা জানাইনি! এমনকি মাকেও না।

-খুব ভালো করেছিস! চাবিটা এখন লাগবে!

-এত গোপন করে, এমনকি মা-কেও লুকিয়ে কী রেখেছিলে লকারে? আমাকে বলা যাবে?

-তোকে না বললে আর কাকে বলবো মা! সরাসরিই বলি, তোর মা আমার বিয়ে করা প্রথম স্ত্রী নয়!

-কী বলছ আব্বু তুমি!

-হ্যাঁরে! সত্যি বলছি! সেটা আমার জীবনের এক অন্যরকম অধ্যায়! অন্ধকারও বলতে পারিস, আলোময়ও বলতে পারিস!

-মাকে জানিয়েছিলে?

-জানাতে চেয়েছিলাম! কিন্তু মন আগায়নি! আর তখন পরিস্থিতি এমন হয়েছিল, মনে হতো জানানোর মতো কিছু নেই। কারণ আমি সেই ঘটনাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে। কিন্তু আজকাল মনে হয়, তোর মাকে

Scanned with CamScanner

জানালেই ভাল করতাম! মনে করেছিলাম সব ভুলে গেছি! সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে! এখন দেখছি, কিছুই মুছে যায়নি! আমি যে অন্যায় করেছি, সেটার প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আমার মুক্তি নেই।

-আব্বু তুমি সব শুরু থেকে খুলে বলো!

-চাকুরিজীবনের শুরুতেই আমার পোস্টিং পড়লো আলজেরিয়াতে। সেখান থেকে কিছুদিন পর পাঠিয়ে দেয়া হয় মরক্কোতে। সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দমন করার জন্যে রিজার্ভ ফোর্স প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল, মাগরিব অঞ্চলকে আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না, তাই বাইরে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করলেও ভেতরে ভেতরে এই অঞ্চল ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। এজন্য কিছু কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

ক: স্থানীয় শিল্পগুলোকে যথাসম্ভব পঙ্গু করে দিয়ে যাওয়া।

খ: সমাজের বিভিন্ন স্তরে ফরাসি চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রোথিত করে দিয়ে যাওয়া!

গ: শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্পসাহিত্যকে পুরোপুরি ফরাসিদের অনুস্মরণীয় করে দিয়ে যাওয়া!

ঘ: একটা নতজানু সরকার ও পদলেহী সেনাবাহিনী তৈরী করে দিয়ে যাওয়া!

ঙ: যেখানে যত মূল্যবান পুরাকীর্তি আছে, সংগ্রহ করে নিয়ে আসা।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা বেশি ভয় করছিলাম বারবারদের। তারা বেশ স্বাধীনচেতা ও যুদ্ধবাজ! এ-ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতায় স্পেনিশ সেনাবাহিনীও কাজ করেছে। বারবারদের ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে বেশি!

আমাদের দলের দায়িত্ব পড়েছিল এক বারবার অঞ্চলে। ওই এলাকাটা ছিল 'হাতে বোনা গালিচার' জন্যে বিখ্যাত। পুরো অঞ্চলের মহিলারা সারাদিন বসে বসে গালিচা বুনতো। অত্যন্ত দামী আর দুর্লভ এক শিল্প সেটা। হাজার বছর ধরে আমাযীগ নারীরা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। চর্চা করে এসেছে। নিপুণতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

আমরা এলাকায় শিবির স্থাপন করেই কাজ শুরু করে দিলাম। পুরো গ্রাম কর্ডন করে চিরুনি অভিযান চালালাম। এলাকা আপাতত বিদ্রোহের শংকামুক্ত

Scanned with CamScanner

হলো। নিয়মিত টহলে থাকলো সেনাদল। আমাদের অফিসার ছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী বুদ্ধির অধিকারী! তিনি দেখলেন, এখানকার গালিচা বেশ সুন্দর! বাইরের ব্যবসায়ীরা গ্রামের বাজার থেকে কিনে নিয়ে যায়। অফিসার কায়দা করে বাইরের পাইকারদের আসা বন্ধ করলেন। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পীদের তো মাথায় হাত! বিক্রি করতে না পারলে খাবে কী? কিছুদিন এই অচলাবস্থা থাকলো। অবস্থা যখন সঙ্গীন আকার ধারণ করলো, তখন অফিসার খোলস ছেড়ে বের হলেন। প্রস্তাব দিলেন,

-নিরাপত্তাজনিত কারণে আমরা বাইরের লোককে এখানে আসতে দিতে পারি না, আবার তোমরাও বাইরে গেলে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়! তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক, তোমাদের গালিচা আমরাই বড় পাইকারদের হাতে পৌঁছে দেবো!

গ্রামবাসী খুশি! এ তো সাধু প্রস্তাব! শুরু হলো গালিচা সংগ্রহ করা! আমরা নামমাত্র মূল্য দিয়ে গালিচা সংগ্রহ করে সব বাক্সবন্দী করে প্যারিসের বাজারগুলোতে পাঠাতে শুরু করলাম। আশাতীত মুনাফা আসতে শুরু করলো। অফিসারের লোভ শতগুণ বৃদ্ধি পেলো।

নিয়মিত গালিচা সংগ্রহে যেতে যেতে গ্রামের মানুষের সাথে একধরনের সখ্যতা গড়ে উঠলো। মধ্যস্বত্বভোগীদের থেকে বাঁচার জন্যে আমি সেপাই নিয়ে নিজেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করে আনতাম! একটা বাড়ির গালিচার কথা সবাই বেশ প্রশংসা করতো, কিন্তু এখন পর্যন্ত ও বাড়ি থেকে একটা গালিচাও আমাদের হাতে আসেনি! খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, তারা আমাদের কাছে গালিচা বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। ব্যাপারটা আমাদের সামরিক মেজাযের সাথে মানানসই নয়!

সিদ্ধান্ত হলো তারা স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে রাজি না হলে জোর-জবরদস্তি করে বিক্রি করাতে বাধ্য করতে হবে। বেশি তেড়িবেড়ি করলে সব গালিচা বাজেয়াপ্ত করা হবে। আমাদের একজন স্থানীয় ইনফর্মার ছিল। সে ইশারা-ইঙ্গিতে এমন করতে নিষেধ করলো। সে বললো,

-ঘরে তিনজন মহিলা থাকে। কোনও পুরুষ নেই। বৃদ্ধা দাদী, একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা ও এক তরুণী। আমাযীগ মহিলারা কড়া পর্দানশীন না হলেও এই পরিবার ভালভাবে পর্দা মেনে চলার চেষ্টা করে। দয়া করে তাদেরকে ছেড়ে দিন!

Scanned with CamScanner

-নাহ, ছেড়ে দেবো কেন? অন্যদের কাছে বিক্রি করলে, আমাদের কাছে বিক্রি করতে সমস্যা কোথায়?

আমি তার কোনও যুক্তি বা অনুনয়ের তোয়াক্কা না করে একাই সে বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সাথে আসা সেনাদেরকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিলাম। আগাম সংবাদ দেয়া ছাড়া, আচানক ঘরের আঙিনায় হাজির হয়ে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তিনবয়েসী তিনজন মহিলা একমনে কাজ করে চলছে! আমাকে দেখে তারা এত বেশি অবাক-বিহ্বল হয়ে পড়লো, প্রথমে ঠাহর করে উঠতে পারলো না কী করবে! পরক্ষণেই সাথে সাথে ওড়না দিয়ে ভাল করে মুখ ঢেকে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলো! ভাবটা এমন, তিনটা শামুক বাধা পেয়ে খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে!

তাদের এই অবস্থা দেখে আমার মনে কী যে হয়ে গেলো, আজও এর রহস্য বের করতে পারিনি! শুধু মনে হয়েছে: আমার এখানে আসা ঠিক হয়নি! আমার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সুরুচির পরিচায়ক নয়। দুঃখিত বলে বেরিয়ে এলাম। সরাসরি ক্যাম্পে চলে এলাম। মাথায় তখন তিনজন অসহায় নারীর করুণ চাহনি ঘুরছে! যেন মিনতি করছে, আমাদের দ্বারা আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। আমরা দুর্বল! শুধু তরুণীর দৃষ্টিতে শেষের দিকে একধরনের রাগ ফুটে উঠেই মিলিয়ে যেতে দেখেছি! এতসব ঘটে গেছে কয়েক মুহূর্তে!

ইনফর্মারকে একান্তে ডেকে পাঠালাম। আমার মন অবিশ্বাস্যভাবে ও-বাড়ির সাথে লেগে আছে। খবর পেয়েই সে ছুটে এল:

-তুমি ওই পরিবার সম্পর্কে কী জানো বলো তো!

-যা জানি সে তো সকালেই বলেছি স্যার!

-আমি ওদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই! ব্যবস্থা করতে পারবে!

-জি! পারবো! কিন্তু কেন স্যার! ওরা বলেছে, একান্তই না মানলে, তারা গালিচা বিক্রি করে দিবে!

-না না, গালিচা নয়, আমি ওদের কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করতে চাই!

-কী বলছেন স্যার! আপনি ক'জন অসহায় মহিলার কাছে দুঃখ প্রকাশ করবেন? আপনি তো কোনও অন্যায় করেননি! অন্য বাড়িতেও এভাবে যান!

-তা হোক, তুমি আগামীকাল তাদের কাছ থেকে একটা সময় ঠিক করে নিও!

পরদিন তরুণ লেফট্যান্ট যথাসময়ে হাজির হলেন। তাকে জানানো হলো,

মহিলারা আত্মীয় ছাড়া আর কারো সামনে আসেন না। আড়াল থেকেই ক্ষমাপর্ব সমাপ্ত হলো। বারবার রীতিতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হলো। প্রতিবেশী ছোট মেয়েরা এটা সেটা এনে দিল। বিদায়ের সময় ইনফর্মার একটা সুন্দর থলে লেফট্যান্টের হাতে তুলে দিল।

-কী আছে এতে!

-একটা গালিচা স্যার!

-কতো দিতে হবে এটার জন্যে?

-কিছুই দিতে হবে না, আপনার ভদ্রতায় তারা খুবই খুশি হয়েছেন! আর বারবার রীতিতে বাড়িতে মেহমান এলে কিছু একটা উপহার দিতে হয়। তাদের ঘরে দেয়ার মতো কিছুই নেই। আপনারা এখানে আসার পর, এ-বাড়ির কর্তা এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন! তারা এখন কোনও রকমে দিন গুজরান করছে!

-নাহ, আমি এমনি এমনি গালিচা গ্রহণ করবো না! কিছু একটা বিনিময় গ্রহণ করতে হবে!

-দুঃখিত স্যার! তাহলে মেযবানকে অপমান করা হবে! তারা দিলে চোট পাবেন!

আলিভিয়া! তুই বিশ্বাস করবি না, ক্যাম্পে এসে ব্যাগ খুলে দেখি: এক অপুর্ব গালিচা! কী নকশা! কী কারুকাজ! কী নৈপুণ্য! কী নিখুঁত কাজ! এসব গালিচা বাজারে বিক্রি হয় না। বাজারেরগুলোর কাজ এত নিখুঁত আর সমৃণ হয় না। অনেকদিন ধরে গালিচার কারবার করতে করতে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে!

-আব্বু! তোমার লকারে কি সেই গালিচাই রেখেছ!

-জি। আরো কিছু অমূল্য জিনিস আছে। খুললেই দেখতে পাবি!

প্রথম সাক্ষাতেই একজন ভিনদেশী শত্রুকে গালিচা উপহার দেয়া কম কথা নয়। একেকটা গালিচা বানাতে মহিলাদের কতো সময় যে লাগে! আমার মনে হলো, তারা এত সুন্দর একটা উপহার দিল, আমারও কিছু একটা দিতে হবে! আবার ইনফর্মারের সাহায্য নিলাম। সে জানাল,

-তারা যাতে গালিচা বিক্রি করে ন্যায্য দামটা পায়, সেটা নিশ্চিত করলেই তাদের সবচেয়ে বড় উপকার হবে!

-তা তো করবই! এ ছাড়া আর কী করা যেতে পারে?

Scanned with CamScanner

-আচ্ছা আমি জেনে নিয়ে আপনাকে জানাবো!

তারা কিছুই নিতে রাজী হলো না। কিন্তু আমার মন তা মানবে কেন! আমি একবার মেয়েটার সাথে কথা বলার অনুমতি চাইলাম। বলা হলো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কোনও অপরিচিত পুরুষের সামনে যেতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না। ব্যাপারটা আমার হজম করতে কষ্ট হলো। আফ্রিকা যাওয়ার আগে অবশ্য আমাদেরকে এসব বিষয় বিস্তারিত জানানো হয়েছিল। তবুও আমরা যেভাবে বেড়ে উঠেছি, তার বিপরীত একটা প্রথা মানতে কষ্ট হয় বৈকি! আমার ধারণা ছিল, আমি একজন অফিসার! তার ওপর বিজয়ী শক্তি! আমি কোনও মেয়েকে ডেটিংয়ের প্রস্তাব দিলে, সানন্দে মেনে নিবে! এখন দেখি ভিন্ন চিত্র!

তাদের অনাগ্রহে আমার আগ্রহ আরও তুঙ্গে উঠে গেলো। যেভাবেই হোক এই পরিবারের সাথে আমার একটা পরিচয়সূত্র কায়েম করতেই হবে। তখন থেকেই মরক্কো নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ তৈরী হয়।

ইনফর্মারের মাধ্যমে আরও কয়েকবার প্রস্তাব পাঠালাম। আমি দেখা করতে চাই! আমাতে অবাক ও হতাশ করে দিয়ে, প্রতিবারই একই জবাব এল। স্বাভাবিক অবস্থায় অন্য কেউ হলে জোর খাটাত! আমিও হয়তো তাই করতাম! কিন্তু কেন যে মন সায় দিচ্ছিল না বুঝতে পারিনি! আজো না। আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে! যে করেই হোক, তার সাথে দেখা করতে হবে। কথা বলতে হবে। এভাবে কেউ কাউকে প্রত্যাখ্যান করে!

ইনফর্মারকে বললাম,

-যে করেই হোক আমাকে তার সাথে দেখা করিয়ে দাও! আমার মান-ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে!

-স্যার আমি চেষ্টা করতে পারি! না হলে আপনি ক্ষমতা দেখিয়েই উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেন!

-আরে সেটা হলে তো কবেই হাসিল করে ফেলতাম! আমি জোরাজুরি করতে চাই না!

-তাহলে স্যার, ইহজীবনেও সেটা সম্ভব হবে না। কারন বাধাটা মেয়ের পক্ষ থেকে নয়, মেয়ের ধর্মের পক্ষ থেকে। তার ধর্মের দৃষ্টিতে আপনি বেগানা পুরুষ! আপনার সাথে দেখা দেয়া বা কথা বলা তার জন্যে হারাম! তবে এটুকু হয়তো করা যেতে পারে! আপনি তার সাথে আড়াল থেকে কথা বলবেন!

Scanned with CamScanner

-না, আমি তার সাথে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে চাই!

-এমন হলে একটাই পথ খোলা থাকে!

-কী সেটা বলো! যত টাকা লাগে আমি খরচ করব!

-টাকা নয়, বিয়ে!

-বিয়ে?

-জি স্যার! আপনার সাথে বিয়ে হলে তখন তার সাথে আপনার দেখা হওয়া সম্ভব!

-তাহলে সেটার ব্যবস্থা করো!

-কিন্তু আপনার সাথে বিয়েও সম্ভব নয়! কারণ আপনি অমুসলিম!

-আচ্ছা! আমি মুসলিম হলেই সমস্যার সমাধান হবে!

-তারপরও সমস্যা থাকবে! তার পরিবার একজন ভিনদেশীর কাছে বিয়ে দেবেন কি না! আপনি আজ আছেন তো কাল নেই! আপনার কাছে বিয়ে দিলো! কিন্তু আপনি তাকে রেখে চলে গেলেন, তখন? অতীতে এমন ঘটনার নজীর আছে!

-আচ্ছা তুমি তাদের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলো! আমিও একটু ভেবে দেখি!

-আব্বু তুমি এতকিছু করছো, তোমার সহকর্মীদের কেউ টের পায়নি?

-এতকিছু কোথায়? আমি তো শুধু তার সাথে কথা বলার বা দেখা করার চেষ্টা করছিলাম! এছাড়া সব কাজ তো ঠিকঠাক মতো চলছিল! আমরা আমাদের এলাকায় কোনও মিটিং-মিছিল হতে দেইনি! এদিকে গালিচা রপ্তানীর ব্যবসাও বেশ রমরমা! শুধু এই 'কেসেই' যা একটু ফেঁসে গিয়েছিলাম! আমার পৌরুষে বেশ ঘা লেগেছিল বলতে পারিস!

-তারপর!

-তারপর আরকি! অনেক ঝুলোঝুলির পর, মেয়ে রাজি হলো! কিন্তু মেয়ে তার বাবার অনুপস্থিতিতে বিয়ে করবে না। মেয়ের বাবা আত্মগোপনে আছে। আবার এদিকে আমার ক্যাম্পেও বিয়েটা গোপন রাখতে হবে! মেয়ের বাবা রাজি হন কি না, সেটা নিয়েও সন্দেহ! তবে আশার কথা, মেয়ের দাদীর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তিনি নিমরাজি!

Scanned with CamScanner

সব কথা বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। সবকিছু গুছিয়ে বিয়ে হলো। বিয়ের আগে বুঝিয়ে দেয়া হলো: শুধু বিয়ের জন্যেই মুসলমান হওয়া ঠিক নয়। আমাকে মনে প্রাণে মুসলমান হতে হবে। মেনে নিলাম। বহুল কাঙ্খিত প্রথম সাক্ষাত হলো। আমি কল্পনার চেয়েও বেশি অভিভূত হয়ে পড়লাম তাকে দেখে! তার ভদ্রতা সৌজন্যবোধ দেখে। আমার প্রতি ওর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসামাখা আচরণ দেখে। আদর-যত্ন দেখে।

আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার সাথে দেখা করতে যেতাম। কারণ আমি যা করেছি, তার জন্যে কোর্ট মার্শাল হওয়াও বিচিত্র কিছু ছিল না। সবাইকে লুকিয়ে কয়েকমাস আমাদের দেখা-সাক্ষাত চললো। তবুও এসব খবর গোপন থাকে না। আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি ধরতে না পারলেও আমার গতিবিধিতে সন্দেহজনক কিছু আঁচ করতে পারলেন। আমার কমান্ডিং অফিসার ডেকে নিয়ে সরাসরি সতর্ক করলেন।

তবুও 'ইয়ামনার' আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার! আমি ফাঁক পেলেই তার কাছে ছুটে যেতাম। এদিকে মরক্কোতে আমাদের অবস্থান দিনদিন নড়বড়ে হয়ে আসছিল! কর্তৃপক্ষের কানে বোধহয় নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন তথ্য গিয়েছিল। তারা একদিন আমাকে নিয়ে বসলেন। তীব্র জেরার মুখে পড়লাম। বিয়ের কথা না বললেও এক প্রকার সম্পর্কের কথা স্বীকার না করে পারলাম না। পুরোদেশের টালমাটাল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, আমার বিরুদ্ধে কঠোর কোনও ব্যবস্থা নেয়া হলো না। তবে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ ফাইলবন্দী করা হলো। আমাকে কোনও সুযোগ না দিয়ে, সেই বৈঠক থেকেই আলজেরিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বলে দেয়া হলো,

-যদি কখনো মরক্কোতে আসি এবং এখানকার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের উভয়ের প্রাণসংশয় দেখা দিবে! এটা ফ্রান্সের সম্মান ও নিরাপত্তার স্বার্থেই করতে হবে!

আমাকে কড়া নজরদারিতে রাখা হলো। ব্যজ কেড়ে নেয়া হলেও, বিশেষ বিবেচনায় ফেরত দেয়া হলো। বিশেষ সুত্রে জানতে পেরেছিলাম: মরক্কোর হাইকমান্ড আরও তদন্ত চালিয়েছিল। তারা সূত্র ধরে ধরে 'ইয়ামনা' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তার বাবার সাথে বিদ্রোহীদের সংযোগও আবিষ্কৃত হয়ে পড়েছিল। এসব ঝামেলার মুখে তারা নিজ গ্রাম ত্যাগ করে অজ্ঞাত কোনও নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে সক্ষম হয়েছিল। এর বেশি কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি!

Scanned with CamScanner

কোনও উপায়ান্তর না দেখে নিজেকে পরিস্থিতির হাতে ছেড়ে দিলাম। কর্তৃপক্ষের চাপে বিয়েও করতে হলো। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আমার ব্যাপারটাকে সিরিয়াসভাবে নিয়েছিল। তাদের বজ্রআঁটুনি ফস্কে নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ ছিল না। আমি দেখলাম বিয়ে করাই সবদিক থেকে যুক্তিযুক্ত। আমাদের উভয়ের জন্যে নিরাপদ। সময়ের সাথে সাথে দগদগে ঘা শুকিয়ে এলো। তবে একেবারে মুছে গেলো না। ইয়ামনার দেয়া গালিচা ও কয়েকটা অপূর্ব হাতের কাজ করা আমার শোপিস কাছেই রয়ে গেলো।

-আব্বু! তার কথা তোমার মনে পড়তো না!

-অবশ্যই পড়তো। কিন্তু কাউকে বলার উপায় ছিল না। তাই বলে মার্থাকে আমি বিন্দুমাত্র অবহেলা করিনি। তাকে আমি শতভাগ স্ত্রীর মর্যাদায় রাখার চেষ্টায় কোনও কমতি করিনি। আর তোর মাও ছিলো এক অসাধারণ মানুষ! তার গভীর অনুরাগ আমাকে সাময়িকভাবে পেছনের কথা ভুলে থাকতে সহযোগিতা করেছে, এটা অস্বীকার করবো না! কিন্তু প্রথম ভালোলাগাকে তো ভোলা অসম্ভব! আর সে আমার বিয়ে করা বৈধ স্ত্রী! পবিত্র। কোমল। গভীর। দৃঢ়চেতা। সাহসী। দায়িত্বশীল। কর্মঠ। গুণী।

-এখন কী করবে?

-করার মতো অনেক কিছুই আছে! কিছুদিন আগে আমি গোয়েন্দাদের লুকিয়ে, প্যারিসের এক মসজিদে গিয়েছিলাম।

-কেন?

-কনফেশন করতে!

-তারা জানাল, ইসলাম ধর্মে মানুষের কাছে কনফেশন করার নিয়ম নেই, যা কিছু সরাসরি গডের কাছেই করতে হয়। খ্রিস্টানদের মতো ভায়া লাগে না। তবুও স্বস্তি পেলাম না। খালি মনে হতে লাগলো, আমি 'ইয়ামনা'র সাথে প্রতারণা করেছি। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, আমি শুধু তার নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করিনি! আমি তার খোঁজ পেয়ে গেলে, ট্রেইল ধরে ধরে গোয়েন্দারাও যদি তাকে ট্রেস করে ফেলে?

অলিভিয়া! ইমাম সাহেবের একটা কথা আমার কানে বেশ বাজে ! তিনি পুরো ঘটনা শুনে বলেছিলেন,

-আপনি তো তাহলে একজন মুসলিম!

Scanned with CamScanner

-কিন্তু আমি তো সামাজিক পরিচয়ে একজন খ্রিস্টান! আমার বিয়েও খ্রিস্টরীতিতে হয়েছে। কারণে-অকারণে চার্চেও যেতে হয়েছে! তাছাড়া ইসলাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। যা কিছু জেনেছিলাম, তার সব ভুলে গেছি!

-তা হোক! আপনি একজন মুসলিম! আপনি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন!

-তার আগে আমি একটা কাজ করতে চাই, আমার পূর্বের স্ত্রীর হদিস বের করতে চাই! তারপর আমি বিষয়টা নিয়ে ভাববো!

-মশিয়েঁ ফিলিপ! আপনি চাইলে উল্টো করেও দেখতে পারেন!

-কিরকম?

-আপনি ইসলাম ধর্ম পালন শুরু করে দিন! আল্লাহ তাহলে আপনার কাজকে সহজ করে দিবেন!

-আচ্ছা ভেবে দেখি!

.

-তুমি তাহলে একজন লোক খুঁজছিলে, সেটা মরক্কো-বিষয়ক গবেষণার জন্যে ছিল না!

-গবেষণাও উদ্দেশ্য ছিল, পাশাপাশি তাকে দিয়ে একটু খোঁজ-খবর করার অভিপ্রায়ও ছিল!

-অমন কাউকে পেয়েছ?

-না।

-আব্বু! এক কাজ করলে কেমন হয়! আমিই নাহয় মরক্কো চলে যাই! একটু খোঁজ-খবর করে আসি!

-সত্যি বলছিস! তোর যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে এটাই সবদিক থেকে নিরাপদ!

অলিভিয়া তার অফিস থেকে লম্বা একটা ছুটি নিল। রাবাতে নেমে সরাসরি ফেজ নগরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। ফেজে পৌঁছে, আব্বুর দেয়া স্মৃতিনির্ভর ঠিকানা অনুসারে খোঁজ করা শুরু করলো। গ্রামের নাম কীকু! এটাই সম্বল। একদিনের চেষ্টা-কসরতে কীকু নামের কয়েকটা গ্রাম চিহ্নিত করতে পারলো। এবার ঝাড়াই-মাড়াইয়ের পালা।

Scanned with CamScanner

প্রতিদিন লং ডিসটেন্স কলে, বাবার সাথে কথা হয়। তিনিও তার নিজস্ব সোর্স কাজে লাগিয়ে, সেসময়কার ক্যাম্পের জায়গাটা সুনির্দিষ্টভাবে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বাপ-বেটির যৌথ প্রয়াসে ঠিক গ্রামটা বের হলো। এবার সরেজমিনে গিয়ে অনুসন্ধানের পালা। অনেক বড় গ্রাম! একজন স্থানীয় গাইডের সাহায্যে গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে কথা বলে জানা গেল, এই গ্রামের অদূরে একটা অস্থায়ী সেনাছাউনি ছিলো। গ্রামের বাজারের পুরনো গালিচা-ব্যবসায়ীরাও আবছা আবছা স্মৃতিমন্থন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু কাঙ্খিত সূত্র পাওয়া গেলো না। হঠাৎ মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো। গ্রামের বয়স্কা কোনও মহিলার কাছে খোঁজ নিলে হয়তো একটা বিহিত হতে পারে! কয়েকজনের সাথে কথা বলেও কিছু বের হলো না। এক বুড়িমা শুধু বলতে পারলো,

-নাম ইয়ামনা কি না বলতে পারবো না! তবে অনেক আগে এই গ্রামের একটা পরিবার উত্তর দিকের একটা গ্রামে গিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করেছে, সেটা মনে আছে। গ্রামের নাম 'আয়াত হামযা'।

আবার নতুন করে পথচলা শুরু হলো। একে তো ভিনদেশী, তায় ভিনভাষী। তবে ভাগ্য বলতে হবে, বয়স্করা কিছু কিছু ফরাসী বোঝে! গ্রামটা বেশ সুন্দর আর ছিমছাম। গাইড প্রথমেই একটা বিরাট ঘরে নিয়ে গেলো। ক্ষুদ্রকুটিরশিল্প। অসংখ্য মহিলা সারিবদ্ধভাবে বসে-দাঁড়িয়ে গালিচা বুনছে! একদল ভেড়ার পশম কাটছে। আরেক দল পশমকে বিশেষ চিরুনির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করছে। অসংখ্য কাজের ধরণ। অলিভিয়ার মনে হলো, সে তার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। অফিসে গেলো। সেখানে এক যুবক বসে বসে ফাইল দেখছে। অনুমতি নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসলো।

-আমি একজন মানুষের খোঁজে এসেছি! একজন মহিলা! নাম ইয়ামনা।

-আচ্ছা! আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

-ফ্রান্স থেকে! বললেন না তো, ইয়ামনা নামে কাউকে চেনেন কি না!

-জি, চিনি! তার কাছে আপনার কী প্রয়োজন? তার নামই বা জানলেন কী করে? (যুবকের চেহারায় ভীষণ বিস্ময়!)

অলিভিয়া ব্যাগ্রস্বরে জানতে চাইল,

-সত্যি সত্যি তাকে চেনেন! আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন!

Scanned with CamScanner

অলিভিয়ার বিশ্বাস হচ্ছিল না এত সহজেই মিলে যাবে। যুবক তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। ঘরে প্রবেশ করে ছেলেটা জোরে আম্মু বলে ডাক দিল। অলিভিয়ার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো, তবে কি এই যুবক তার সন্তান? তার আবার বিয়ে হয়েছিল! এসব ভাবনার মাঝেই একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা এলেন। দেখেই অলিভিয়া দাঁড়িয়ে গেলো। তার দু'চোখ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, এত সুন্দর মানুষও হয়! ইনিই কি তিনি?

-আমি অলিভিয়া! ফ্রান্স থেকে এসেছি!

-বুঝতে পেরেছি! আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তোমাকে কেউ একজন পাঠিয়েছে। ঠিক না?

-কিভাবে বুঝলেন?

-ওই যে বললাম অনুমান! ঠিক কি না বলো!

-একদম ঠিক! আমার আব্বু পাঠিয়েছেন।

মহিলা এবার এসে গভীর আবেগে অলিভিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেকক্ষণ ধরে থাকলেন। ঝাপসা চোখে অলিভিয়াকে পরম আদরে চুমু দিলেন। প্রায় কোলে করে নিয়ে সোফায় বসালেন। তারপর শুরু হলো কথাবার্তা। অলিভিয়া সবকিছু খুলে বললো বাবার অসহায়ত্বের কথা, সরকারী গোয়েন্দাদের নজরদারির কথা!

-আমি তো সব বললাম, আমি এসেছি আপনাকে দেখতে। আপনার কথা শুনতে!

-আমার কথা আর কী শুনবে! বলার মতো তেমন কিছুই নেই!

-তবুও শুনবো! বলুন!

-এখন থাক! তুমি এতদূর থেকে এসেছ! বিশ্রাম করো। খাওয়া-দাওয়া করো! রাতে বসবো! আর হ্যাঁ, ও তোমার ভাই! মা ভিন্ন হলেও বাবা এক!

-তাই!

অলিভিয়া বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়বো। দু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। সে উপলব্ধি করতে পারলো, আব্বু যেভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, সেটা বাস্তবিকই যথার্থ ছিল না। তিনি আরও অনেক বেশি মহিয়সী!

Scanned with CamScanner

রাতে খাবার শেষে ছোট্ট মেয়ের মতো আদর করে নিজের খাটে নিয়ে বসালেন। ইয়ামনা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। ফরাসি ভাষাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু হৃদয় যেখানে দ্বার খুলে দেয়, ভাষা সেখানে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

-আপনার কথা বলুন! একটুও বাদ দেয়া যাবে না!

-আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ইয়ামীন মানে তোমার বাবা কোনও কাজে ব্যস্ত আছে। মুসলমান হওয়ার পর আব্বু আমার নামের সাথে মিলিয়ে তার নাম রেখেছিল ইয়ামীন! আমরা কিছু মনে করলাম না। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছিল। আমাদের সম্বিত ফিরল পরপর কয়েকদিন অন্য সেনা কর্মকর্তা গ্রামের টহলে আসতে দেখার পর! খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ইয়ামীনকে কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে!

তারপরও মনে মনে আশা ছিল, সবকিছু গুছিয়ে যোগাযোগ করবে। সেই আশাতেই জীবন কেটে গেলো। সে চলে গেলো। এদিকে আমাদের ওপর নিত্য নতুন হয়রানি শুরু হলো। অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে দেখে আমরা রাতের আঁধারে গ্রাম ত্যাগ করি! বিভিন্ন স্থান ঘুরে, এই গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

আব্বু-আম্মু-দাদু মিলে বহু চেষ্টা করেছিলেন বিয়ে দেয়ার। ভাল ভাল সম্বন্ধও এসেছিল! কিন্তু একে তো আমি সন্তানসম্ভবা অন্যদিকে সবসময় মনে হতো এই বুঝি ও এলো! কারণ ভিনদেশী হলেও আমাদের তিনমাসের সংক্ষিপ্ত সংসারজীবনে তাকে যেভাবে চিনেছি আর যাই হোক, প্রতারক মনে হয়নি! আমার মন বলতো, সে নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে! ওটা কেটে গেলে ঠিকই ছুটে আসবে!

সন্তানের জন্ম হলো। তাকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটলো। ও একটু বড় হওয়ার কিছু সময়ের জন্যে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। তখন দেশ নতুন স্বাধীন হয়েছে! অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়! মনের মধ্যে একটা খেয়াল এলো,

-গ্রামের মহিলাদেরকে একসাথে করে, কিছু করা যায় কি না? ভাবতে ভাবতে বের হলো, সবাই তো গালিচা বানাতে পারে! এটাকেই কিভাবে আরও গতিশীল করা যায়? একা একা গালিচা বুনতে গেলে অনেক সময় লেগে যায়! কিন্তু কয়েকজন মিলে করলে, অতিদ্রুত কাজ তুলে ফেলা যায়! তাই প্রথম দিকে তিনজনের একটা দল গঠন করে, যৌথভাবে কাজ শুরু করলাম। আস্তে

Scanned with CamScanner

আস্তে দল ভারী হতে হতে, গ্রামের সবাই এখন আমাদের এই ভবনে কাজ করে। সবাইকে তার কাজের ধরন অনুযায়ী মুনাফা দেয়া হয়।

হিশেব রাখা হয়, কে কতটুকু কাজ করেছে! ফাঁকি দেয়ার অবকাশ কম! তাদের মেহনতও কমে এসেছে বহুগুণ, আবার আয়-রোজগারও বেড়েছে !

-আচ্ছা আম্মু! এই যে দীর্ঘ একটা সময় একা একা কাটিয়ে দিলেন, খারাপ লাগেনি?

-একদম লাগেনি তা নয়, কিন্তু নিজেকে সবসময় কোনও না কোনও কাজে জড়িয়ে রেখেছি! খুব বেশি ভাবার ফুরসত মেলেনি! স্কুলে সময় দিয়েছি! মেয়েদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি! হাতের কাজ শিখিয়েছি! এই করেই জীবনটা কিভাবে যেন পার হয়ে গেছে প্রায!

-আম্মু! আসল প্রশ্নটা করি! আব্বু যদি আপনার সাথে দেখা করতে আসতে চায়, আপনার আপত্তি নেই তো!

-আমার সাথে তো তার ছাড়াছাড়ি হয়নি! আমি তার স্ত্রী। ও আমার স্বামী! তাকদীর আমাদেরকে একটা পরীক্ষায় ফেলেছিল! এখন হয়তো জোড়া লাগাতে চাইছে! আর সত্যি বলতে কি, আমি তার প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে গুণতেই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এলাম। তাকে পেয়ে আবার হারাতে চাইবো কেন?

-আব্বু চাকুরিতে থাকাবস্থায়, তার ওপর বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখন সেটা নেই। তবুও কিছু আইনি বাধা ছিল, এতদিনে সেটা কেটে গেছে আশা করি! এখানে টেলিফোন না থাকাতে এতবড় একটা সুসংবাদ তাকে দিতে পারছি না! আগামীকাল তার সাথে কথা বলবো! আপনি কি আমার সাথে যাবেন?

-না মা, তার সাথে আমার দেখা ও কথাটা সরাসরি হোক! আগে কথা বলে এতদিনের জমিয়ে রাখা আবেগ-অনুরাগ হালকা করতে চাই না!

= জগতের সকল দম্পতি সুখী হোক! =

Scanned with CamScanner